পরিচয়

শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- ☐ প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ৫৭টি গান
- ☐ গান নিয়ে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দু'টি লেখা
  - ■ আনমনে গান মনে
  - ■ বীরেনদা'র কবিতা আমার গান
- ☐ প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান
  - ■ পর্যালোচনা /সমালোচনা/ মতামত
- ☐ চিঠিপত্র

সৌজন্যে

রিজেন্ট স্পেশাল ফিল্টার

নিউ টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড

প্রযত্নে ঃ মেসার্স আর ডি বিল্ডার্স এন্ড ডেভেলপার্স লিমিটেড
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড পোঃ কামারহাটি কলকাতা ৭০০ ০৫৪

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক

পর্বান্তর

শিল্পসাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক
প্রথম বর্ষ / তৃতীয় সংখ্যা / জুলাই ১৯৯৪

সম্পাদক
পার্থ বন্দোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক
রঞ্জন রায়

প্রচ্ছদ লিপি
অজয় গুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইনটিগ্রেটেড গ্রাফিকস্
২এ, চৌরঙ্গী স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

যোগাযোগ
৫২এ, হাজরা রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯
দূরভাষ ঃ ৪৭৫-২৯৫৪

সূচী

সম্পাদকের কথা ৩

চিঠিপত্র ৯

নির্বাচিত গান ১৭
প্রতুল মুখোপাধ্যায়

আনমনে গান মনে ৬৫
প্রতুল মুখোপাধ্যায়

বীরেনদার কবিতা আমার গান ৯৮
প্রতুল মুখোপাধ্যায়

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান

পর্যালোচনা/সমালোচনা/মতামত ১০৫

সম্পাদকের কথা

এক.

জুলাই '৯৩ থেকে জুন '৯৩—কথা ছিল এই এক বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশ করবো আমরা। শেষ পর্যন্ত তিনটি বার করতে পারছি। অর্থাৎ আমরা এক সংখ্যা পিছিয়ে পড়লাম। যা হোক, শুরুতে একটা কৈফিয়ৎ পাঠকদের দিতেই হয়। আগাম ঘোষণা ছিল তৃতীয় সংখ্যায় উৎপল দত্তর সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হবে। কয়েকটি অনিবার্য কারণে আমরা তা ছাপতে পারলাম না। কারণগুলো যথাসময়ে অবশ্যই পাঠকদের জানানো যাবে। আশা রাখছি, আগামী সংখ্যায় ছাপা সম্ভব হবে।

চিঠিপত্র বিভাগটি হ'ল পাঠকদের সাথে আমাদের নিবিড় যোগাযোগের সেতু। এই কলাম চালু রাখায় দায় একান্তভাবে পাঠকদের। আমরা আনন্দিত, পাঠক সেই দায় গ্রহণ করেছেন। জেলা থেকে চিঠি আসছে, বন্ধুদের/দূরের পাঠকদের। প্রিয় পাঠক, এই যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখুন, সম্ভব হ'লে আরো বাড়ান। পাঠকবিহীন পত্রিকা জল ছাড়া মাছ। আলোচনা করুন, পরামর্শ দিন, সমালোচনা করুন—নিজের মতামত অকপটে জানাতে দ্বিধাহীন হোন।

পর্বান্তর প্রথম থেকেই বন্ধুদের প্রবল উৎসাহ ও সমর্থন পেয়ে আসছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি—বরং তা আরো বেড়েছে। তাদের সাহায্য ভোলবার নয়। মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের ছোট করতে চাই না। আমাদের আর্থিক দায় চালু রাখতে বিজ্ঞাপনদাতারা যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

দুই.

বছর খানেক আগে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান নিয়ে কেউ কিছু লিখতে বললে, ছোট্টখাটো একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু এখন—এই '৯৪ এর জুনে। এই সময়ে, মিডিয়ার নবতম পুনরাবিষ্কার তিনি। তাকে নিয়ে এখন চারদিকে হৈ হৈ। এখন তার বাজার হয়েছে। এমতাবস্থায় 'শতং বদ মা লিখ' নীতিই ছিল আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা। তথাপি সম্পাদককে কলম চালাতেই হয়—বিশেষ করে সংখ্যাটা যখন প্র. মু.'র গান নিয়ে।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান অন্যদের গলায় শুনেছি তা প্রায় ২২/২৪ বছর। প্রতুলদার সাথে আলাপ হবার পর, সেও এক যুগ, কত কত বার কত বিচিত্র সব পরিবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে শুনেছি তার গান। যারা তার গান শুনেছেন, অন্তত এই একটা ব্যাপারে সকলেই একমত হবেন, তার গান শুধু শোনার নয়—দেখারও বটে। প্রাণের তাগিদ থেকে গানের তাগিদ, নাকি উল্টোটাই কখনো কখনো, কে জানে, আমরা বিস্মিত—আমরা আলোড়িত। আহা! কি এক একখানা গান। একেবারে মাতিয়ে দিচ্ছে। কি তার শক্তি! কি তার সৌন্দর্য! প্রাণের যত বিদ্রোহ বিপ্লব ঘৃণা ভালোবাসা বেদনা বিষাদ সব—সব আছে তার গানে। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, মজা কোনো রসের ঘাটতি নেই। বীররস বেদনারস মিলেমিশে একাকার। কিভাবে পশ্চিম বাংলার শহর-শহরতলী থেকে প্রত্যন্ত সুদূর গ্রামগঞ্জে তার গান পৌঁছে গেছে, আমরা তার প্রত্যক্ষদর্শী। প্রচার মাধ্যমের আলোয় উদ্ভাসিত হবার ঢের ঢের আগে থেকেই তার গান কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং করছে, আমরা তার পুরোনো সাক্ষী। তাহলে কিছু কথা বলার হক আমাদেরও থাকছে। ঝোলা আমাদের নেহাত খালি নয়—শূন্যতো নয়ই। কিন্তু আমরা কি ভাবছি, না ভাবছি, তার চেয়েও জরুরী এটা জানা এবং জানানো গান নিয়ে প্র. মু. এযাবৎ কি করেছেন, কি ভেবেছেন আর সাম্প্রতিক কালে আর পাঁচজনই বা কে কি বলছেন—ভাবছেন। এরকম একটা ভাবনা থেকেই বর্তমান সংখ্যার পরিকল্পনা। এতে থাকছে কালক্রম অনুসারে নির্বাচিত ৫৭টি গান। গান নিয়ে তার দুটি লেখা। 'আনমনে গান মনে' লেখাটি তিনি বিশেষভাবে আমাদের এ সংখ্যার জন্য লিখে দিয়েছেন। অন্য লেখাটি 'বীরেনদার কবিতা আমার গান' পুনর্মুদ্রণ / বীরেন্দ্রপত্র / এক)। এ দুটি লেখায় পাঠক পাবেন, গান নিয়ে তার নিজের ভাব-ভাবনার কথা। আর থাকছে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্র. মু. র গানের পর্যালোচনা / সমালোচনা ও মতামতের অংশবিশেষ।

৫৭টি গানের নির্বাচন নিয়ে পাঠক-পাঠিকারা যে সম্পাদকের সাথে একমত হবেন, এতটা আশা করি না। 'এ গানটা নেই কেন' 'ও গানটা বাদ দেওয়া যেত' এমন অভিযোগ প্রায়ই শুনতে হবে। না, কোন তর্ক নেই, এটাই স্বাভাবিক। এই নির্বাচনে তার জনপ্রিয় গানগুলো তাদের জনপ্রিয়তার দাবীতেই সবার আগে জায়গা করে নিয়েছে। তার মানে অবশ্য এ নয়, তার সমস্ত জনপ্রিয় গানই আমরা রাখতে পেরেছি। তাছাড়া কোন শিল্পীরই সব গান সমান

জনপ্রিয় হয় না। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা থাকেই। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচিবোধ, সঙ্গীত-বোধের তারতম্যে শ্রোতা দর্শকরাও নানা স্তরে বিভক্ত। যে গান আপনাকে তেমন টানেনি--সে গান আমাকে টেনেছে। যে গান আমাকে টানেনি সে গান হয়তো ভুবনবাবুকে মাতিয়েছে। যে ভাবেই হোক জনপ্রিয়তার দাবী আমরা এড়াতে পারি নি—চাইও নি। আবার এমন কিছু গান এখানে নিশ্চয়ই আছে, যেগুলো ততটা জনপ্রিয়তা এখনো পায়নি। আমাদের মনে হয়েছে, এসব গান রাখা দরকার। প্র. মু. র গানের নির্বাচনে এসব গান অনিবার্য।

কবিতা থেকে গান দিয়েই সুরকার প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের আরম্ভের আরম্ভ। সেটা '৫৪-'৫৬তে। তারপর '৬৮-'৬৯এ যখন তিনি আসছেন, তখন আর কবিতা থেকে গানই নয়, নিজেই লিখতে শুরু করেছেন। এবারে রাজনৈতিক প্রবন্ধ, রচনা থেকে গান। হ্যাঁ, এটাই ঘটনা। মাও সে তুংয়ের রচনা থেকে একটার পর একটা গান। চারু মজুমদারের লেখা থেকে 'মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি' গান। কবিতা থেকে গান বাংলায় নতুন নয়। কিন্তু প্রবন্ধ থেকে গান। সে বোধহয় প্র. মু.'ই প্রথম। তা বলে তিনি তো প্রবন্ধে সুর লাগান নি, রীতিমত গান বানিয়ে ছেড়েছেন। '২৬-'২৭ বছরের ব্যবধানেও সেই সব গান তাদের জনপ্রিয়তা হারায় নি। তারপর নিজেও লিখেছেন অনেক স্মরণীয় গান। সে সব গানের উৎসে বা অনুপ্রেরনায় কবিতা প্রবন্ধের কোন সূত্র নেই। নির্বাচিত ৫৭টি গানের সূচীতে প্র. মু.'র রচিত-সুরারোপিত গানগুলো মোটামুটি এভাবেই এসেছে। একটা ছোট তথ্য, ৫৭টি নির্বাচিত গানের ভেতর ৩৮টি কবিতা থেকে। এতে দেশী-বিদেশী খ্যাত-অখ্যাত কত কবির কবিতাই না আছে। কবিতা থেকে সরাসরি গান হয়েছে, আবার কখনো বা গীতিরূপান্তরে ইষ'ৎ পরিবর্তিত। কবিতা থেকে গান করতে গিয়ে গীতিকার সুরকারকে কবিতা ভাঙ্গতে হয়েছে। রদবদল ঘটাতে হয়েছে বিন্যাসের, কখনো যুক্ত হয়েছে নতুন শব্দ, কথা। আবার কখনো বর্জিত হয়েছে এমনকি কয়েক স্তবক। গান গানই—সেতো আর কবিতা নয়। সে এক ভিন্ন সৃষ্টি। প্র. মু. তার গানগুলোর তলায় পাশে নানা রকমের নোট দিয়েছেন। আমরা যথাসম্ভব নোট বর্জন করেছি। কয়েকটি গানে অবশ্য সংক্ষিপ্ত নোট দিতেই হয়েছে। ছাপার অক্ষরে পড়ার পর মনে হয়েছে আরো কয়েকটি গানের নোট দরকার ছিল। যেমন, 'অঙ্কুশপুরমের অঙ্কুশ তুমি অত্যাচারীর ভয়' গানের অঙ্কুশপুরম যে চেরাবাণ্ডারাজুর জন্মগ্রাম এ তথ্য জরুরী ছিল। 'নকোসী সিকেন্দে আফ্রিকা'

গানে সঠিক উচ্চারণ হবে 'নকোসী সিকেলে আফ্রিকা'। ভুল উচ্চারনটি পরে ঠিক করে নিয়েছেন প্র. মু.। এরকম প্রয়োজনীয় নোট আরো থাকতে পারতো, এখন আর আপশোষ করে লাভ নেই।

গান তো ছাপা হল—তারপর! বোবা হরফগুলোর সাধ্য নেই কানের ভেতর দিয়ে মর্মে পৌঁছে যায়—হয়ে ওঠে গান। ছাপার অক্ষরে গান হ'ল প্রাণহীন কথার শরীর। আলাদাভাবে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। মানছি—কিন্তু পুরোপুরি নয়। মনে করুন নির্বাচিত গানের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কেউ হঠাৎ গেয়ে উঠলেন, 'থাক না হাজার অযুত বাধা'। ব্যাস, মুহূর্তে হরফ-গুলো হয়ে গেল গান। পাঠককে যে গায়ক হতেই হবে তেমন মাথার দিব্যি নেই। নিজের মত করে তিনি গাইতেই পারেন, 'পৃথিবীর বুকে উষর মরুতে ফুল ফোটাও' কিংবা 'ধূসর শহরের প্রান্তে প্রান্তরে / জাগাও শূন্যের আজান গান'—তাহলে? গানের কথা তখন আর জড় পদার্থ নয়—প্রাণময়। গান ছাপার এ হ'ল একদিকের যুক্তি। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল—কালক্রম অনুসারে গানের কথাগুলোর ভেতর দিয়ে গেলে, আর কিছু হোক আর নাই হোক, স্রষ্টার, শিল্পীর চিন্তন প্রক্রিয়ার একটা স্বরূপ অবশ্যই ধরা পড়বে। কি গান প্র. মু. গাইছেন, সেই সব গানের সাথে তার অনুভব-চেতনার জগৎ কি ভাবে কাজ করছে, শিল্পীর মনন, দার্শনিক দৃষ্টি কোথায় কি ভাবে তার নির্মাণকে দিশা দেখাচ্ছে—এসব আলোচনা উঠলে ছাপার হরফের গান অপরিহার্য। প্র. মু. যে গান গেয়ে থাকেন তার প্রথম ও প্রধান পরিচয় কাব্যগীতি। তো এই কাব্যগীতি কথাটা হ'ল দুই শব্দের জোড়। সেক্ষেত্রে প্রথম শব্দ 'কাব্য' ফেলনা নয়, তাকে বর্জন করা অসম্ভব।

গানের কাব্য বা বানী নিয়ে যত কথাই লিখি না কেন, তাতে গানের কিছুই বোঝা গেল না। বোঝা যায়, বোঝা যাবে সুরের আরোপে, তা আরো স্পষ্ট হবে, জীবন্ত হবে গানের পরিবেশনে। সবটা মেলালে তবে গানের আসল পরিচয়। প্র. মু.'র গানের সুর নিয়ে সারগর্ভ কিছু বলার তেমন ক্ষমতা আমার নেই। দীর্ঘদিনের পুরোনো শ্রোতা হিসেবে মনে হয়েছে রচয়িতা, গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে ছাপিয়ে গেছে সুরকারের প্রতিভা। বাংলা গানে তিনি যে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা সবিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। অরুণ মিত্র, অন্নদাশংকর রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, মিরোশ্লাভ হোলুব, জাক প্রেভের প্রমুখ আধুনিক

কবিদের কবিতায়, কিংবা নিজের রচিত 'চ্যাপলিন' গানে তিনি যে সব সুর লাগিয়েছেন আমাদের কাছে তা অভাবনীয়, বিস্ময়কর। আমি কয়েকটা বিশেষ গানের কথা উল্লেখ করলাম মাত্র। পরিচিত শ্রোতা-দর্শকদের নিশ্চয়ই আরো অনেক অনেক গানের কথা মনে পড়বে।

হাতে থাকছে—শিল্পীর গায়নভঙ্গী বা পরিবেশন। প্রতুলদার গান যারা সামনে থেকে কখনো শোনেন নি বা দেখেন নি—তাদের তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। কোনো যন্ত্র নেই, তালবাদ্য নেই, স্রেফ নিজের স্বরযন্ত্রটি আর সমগ্র শরীরের ছন্দে বেজে উঠছে গান। শুধু কথা নয়—নানা রকম ধ্বনি, shout, যন্ত্রসঙ্গীতের আভাস-অনুষঙ্গ, প্রিল্যুড, ইণ্টারল্যুড সব পাওয়া যাচ্ছে—স্রেফ গলায়। চোখ, মুখ, চুল, কাঁধ, হাতপা সমস্ত শরীর দিয়ে গান। আমার সংকীর্ণ চেনাজানার জগতে অন্ধ্রের বিপ্লবী সঙ্গীতশিল্পী ভি. বি. গদারকেই এমনটি গাইতে দেখছি। ও অবশ্য সুযোগ পেলেই ডাম্পু ব্যবহার করে। তবে ডাম্পুবিহীন গদারকেও বিন্দুমাত্র ম্লান মনে হয়নি কখনো। বিগত পঁচিল তিরিশ বছরে পঃ বাংলার প্রায় সমস্ত সেরা শিল্পীদের গান সামনে থেকে শোনার ও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। না, কাউকেই প্র. মু.'র মত গাইতে শুনিনি। আমি কন্ঠসম্পদের কথা বলছি না—বলছি গায়নভঙ্গী, পরিবেশনের কথা। এ জায়গায় তিনি অনন্য এবং অদ্বিতীয়।

গায়নভঙ্গীর কথাই যখন উঠলো, শিল্পীর কন্ঠস্বর বা গলার কথাটা উঠবেই। প্রতুলদার গলা নিয়ে নানা জনের হাজার রকম অভিমত শুনেছি, সেখানে নিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ দুই-ই আছে। আমার সায়, জিন্দাবাদের দিকে। কারণ ঃ অসাধারণ সুরেলা তার গলা। ততোধিক আশ্চর্য স্বরবিস্তারের, অব্যর্থ স্বর-ক্ষেপনের ক্ষমতা। একজন গায়কের কাছে সর্বাগ্রে আমরা তো এদুটি জিনিসই দাবী করবো।

উন্নাসিকরা যথারীতি নাক সিটকোতে পারেন তবু একথা জোর দিয়ে বলা দরকার, প্র. মু. শূন্য থেকে বাংলা গানে আসেন নি—এসেছেন গণসঙ্গীতের ধারা থেকেই। সেদিক থেকে তিনি মোটেই কোনো নিরপেক্ষ শিল্পী নন। '৫৪-'৫৬তে মঙ্গলাচরণ এবং বিষ্ণু দে'র যে দুটি কবিতাকে তিনি গানে বেঁধেছেন—দুটি কবিতাতেই মজুর কিষাণরা হাজির। দীর্ঘ বারো বছর পর যুবক প্রতুল যখন আবার গানে ফিরলেন, তখন তিনি নকশালবাড়ীর লাল আগুন দিক্-দিগন্তে ছড়িয়ে দেবার শরিক। পুরোপুরি পার্টিজান। অবশ্য তার হাতে বন্দুক

ছিল না গলায় ছিল গান। দেখা যাচ্ছে, সঙ্গীতজীবনের একেবারে সূচনা থেকেই মার্কসীয় চিন্তাধারা, মার্কসীয় মতাদর্শ তার গানের ভেতর ঢুকে পড়েছে। প্র মু. তা বর্জন করেননি, সচেতনভাবে লালন পালন করেছেন। ফলত, তার গানে মিশেছে এক গভীর দার্শনিক প্রত্যয় ও প্রজ্ঞা। কোথায়ো তা জবরদস্তি বলে বোধ হয়নি।

সময় বদলায়, পৃথিবী বদলায়—বদলে বদলে যায় গান। ভেতরের মানুষটিও আর নিজেকে না বদলে পারেন না। আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত প্র. মু.'র গানকে এককথায় গণসঙ্গীত বলে চিহ্নিত করা সহজ ছিল। কিন্তু আশির মাঝামাঝি থেকে তিনি এমন অনেক গান করেছেন, যাকে গণসঙ্গীতের প্রচলিত সংজ্ঞা বা সীমায় ঠিক বাঁধা যায় না। কিন্তু খুব অন্তরঙ্গভাবে দেখলে দেখা যাবে, শোষণহীন, বঞ্চনাহীন একটা ভালোবাসার পৃথিবী, স্বপ্নের পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন থেকে এক ইঞ্চি সরে যায়নি তার গান। বলার ঢং বদলেছে, রূপ বদলেছে, বলার কথাও হয়তো বেশ কিছুটা বদলেছে, কিন্তু শিল্পীর দার্শনিক দৃষ্টি-কোণ তাতে আবিল হয়নি—আরো গভীর হয়েছে। ভেতরের মানুষটিকে আরো দৃঢ়তা দিয়েছে। প্র. মু.'র দুর্দান্ত সৃজনশীলতাই তার অকাট্য প্রমাণ। আমরা শিল্পীর সৃষ্টিময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তারই গানের লাইন তুলে বলি ঃ ভালবাসো নাও / ভালোবাসা ছড়াও / পৃথিবীর বুকে উষর মরুতে ফুল ফোটাও।

শেষ করার আগে আর একটি কথা। 'পেশাদার না হ'লে এযুগে সাফল্য অসম্ভব' এই চলতি অভিমতটা জোরালোভাবে খণ্ডন করেছেন অপেশাদার প্র. মু.। টাকার জন্য নয়—তিনি গান গাইছেন একটা আদর্শের জন্য—স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য। সাবাশ।

ছাপার ভুল এড়ানো গেল না। শুদ্ধিপত্র দিয়ে আর বিব্রত করতে চাই না। প্রিয় পাঠক, আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহন করুন।

নমস্কারান্তে

৬ জুলাই, ১৯৯৪ পার্থ বন্দোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

প্রিয় পার্থ,

আপনার 'পর্বান্তর' এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমাকে গভীরতর ভাবনার প্রসাদ জুগিয়েছে। হাতে গোনা যায় এমন ধরণের কাগজ হয়তোবা, ছাইচাপা আগুনের কাজ করে।

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর 'একটি জীবন' অনাবিস্কৃত জীবন-ভূখণ্ডের এক মানচিত্র ব'লে মনে হয়। 'একটি জীবন'এর, রচনাকার'ত সমাদার পাবেনই, তারও চাইতে বেশী করে স্থান জুড়ে আছেন বন্ধু রাজা মিত্র। তিনি একজন আবিস্কর্তা'র ভূমিকাও পালন করেছেন তার নাট্য-চেহারা নির্মানে।

বিধ্বস্ত জীবনের লোকায়ত ভাষায় যে সমাজ-সংস্কৃতির morbidity-র লেখচিত্রও তিনি গঠন করেছেন তা' দরিয়ার আগামী মাঝি-মাল্লারাও 'দিগ্ নির্দেশক' হিসাবে মানবেন। এর বেশী বলার হিম্মৎ আমার নেই।

'পর্বান্তর' এর দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। শক্ত হাতে এর সম্পাদনা চালিয়ে যান। এর সঙ্গে জড়িত রাজা, মুন্নাকেও আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা জানাচ্ছি। আপনাকেও।

২৮. ১. ৯৪ রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

□

পার্থদা,

পর্বান্তর-এর জন্যে অভিনন্দন। একটি জীবন নিয়ে আপনার কাজ প্রশংসনীয়। এরকম কাজ আরও আরও চাই পর্বান্তরে।

সত্তর দশক নিয়ে আরও কাজ করা যায়না, যখন এদেশে মেরুদণ্ডহীনতার চর্চা চলছে, তখন আরও সেই উস্‌কে ওঠা দিনের কথা মনে করিয়ে দিন।

পুরুলিয়া একবার ঘুরে যান, এখন এ খরার দেশে পলাশ আর পলাশ।

চিঠি দিন। প্রীতিময়তায়।

পুরুলিয়া ১৭/২/৯৪ নির্মল হালদার

□

সুপ্রিয় পার্থ,

দ্বিতীয় সংখ্যাটি পেলাম রথীনের হাত থেকে। সুন্দর।

রাজা-র ছবিটি দেখেছি। চিত্রানাট্য পড়া আলাদা লাভ। সঙ্গে সাক্ষাৎকার। রাজাকে এবং তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

'ব্যাস' পড়তে পারিনি পাইনি বলে। দুঃখ থাকল। পত্রিকা চালানোর অভিজ্ঞতা তোমার কিছু কম নেই। মাঝপথে বন্ধ করো না। চালাও কিছু-কাল। সুস্থ পাঠক আছেনই। সুস্থ লেখক আর সম্পাদকেরই আকাল।
বাইশে মার্চ, চুরানব্বুই। সাগর চক্রবর্তী

□

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, ১৯ ২ ৯৪

বাঙলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই বলা চলে। চাকরী সূত্রে আমি এখন প্রবসী বাঙালী। বাঙলার শিল্প সাহিত্যের বর্তমান ধারার সঙ্গেও যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমার হাতে এসে পড়লো আপনার সম্পাদিত প্রথম সংখ্যার "পর্বান্তর", যার শুরুতেই আপনি অকপটে ঘোষণা করেছেন "ম্যানিফেস্টো" থেকে 'পর্বান্তর'-এ পরিবর্তনের কথা। যে পরিবর্তন আমার চোখে একটা major shift হলেও, অবশ্যম্ভাবী। প্রেক্ষাপটটা যদি সারা বিশ্বে ধরা যায়, সেখানে communist world, capitalist world, Third world countries সর্বত্রই এই পরিবর্তনের সুফল কুফল নিয়ে মূল্যায়নের সময় হয়তো এখনও আসেনি। আর তাছাড়া মার্ক্সসীয় দর্শনের প্রধান সূত্রই তো এই 'পরিবর্তন'।

সাধুবাদ জানাই সম্পাদককে এই সময়োপযোগী পরিবর্তনের জন্য, বিশেষ করে প্রথম সংখ্যায় শাহযাদ ফিরদাউস এর লেখা 'ব্যাস' উপন্যাস পড়ে, চমকে উঠে মনে হয়েছে পর্বান্তর-এর প্রথম সংখ্যাই জানান দিচ্ছে আগামী দিনে পর্বান্তর সমাজ সচেতন শিল্পকর্মের ধারায় এক নতুন জোয়ার আনবে।

"যে বুক দিকে মাটির স্পন্দনের সঙ্গে নিজের স্পন্দন মিলিয়ে অন্যকে তা শোনাতে পারে সেই হল যথার্থ স্রষ্টা,"। মহাভারত স্রষ্টা ব্যাসদেসের কোন বিশেষ রূপ আমার কাছে কখনো ধরা পড়েনি, কিন্তু ফিরদাউসের 'ব্যাস' এ ব্যাসদেবকে এক মহান স্রষ্টারূপে দেখতে পেয়ে অভিভূত হয়েছি।

পর্বান্তর-এর প্রথম সফল সংখ্যা, উৎসাহিত সম্পাদকমণ্ডলীকে নিশ্চয় খুবই সক্রিয় করে তুলেছে, তারই ফলস্বরূপ আবার কিছুদিনের মধ্যেই আমার হাতে এসে পড়েছে পর্বান্তর-এর দ্বিতীয় সংখ্যা।

প্রথমেই বলি প্রথম সংখ্যা পড়ার পর স্বভাবতই দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য যে আশা (desire for the quality) জন্মেছিলো, সেটা পূরণ হয়েছে দ্বিতীয় সংখ্যা হাতে পেয়ে। "এক্ষন"এর কল্যানে শ্রী সত্যজিৎ রায়ের কিছু ভালো

ছবির চিত্রনাট্য পড়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। কিন্তু পর্বান্তর-এ ছাপা শ্রী রাজা মিত্রের 'একটি জীবন'-এর চিত্রনাট্য, শুধুমাত্র চিত্রনাট্য পড়ার অভিজ্ঞতা নয়, মনে হয় যেন কোন একটা আদর্শের কাছে সম্পূর্ণরূপে Committed এক মানুষের অদম্য জীবন সংগ্রামের দলিল পড়ছি। আরো একটা বড় দিক হল, চিত্রনাট্য পড়ার আগে শ্রী বুদ্ধদেব বসুর মূল গল্পটা পড়ার সুযোগ করে দিয়ে সম্পাদক হিসেবে আপনি এক নতুন dimension এনেছেন, এর আগে অন্য কোন পত্রিকায় এই সুযোগ পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই।

বাঙলা ভাষাকে আমরা যারা ভালবাসি, বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধ রূপ যাদের আলোড়িত করে শ্রী বুদ্ধদেব বসুর 'একটি জীবন' তাদের কাছে এক মহান সৃষ্টি, এই গল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা করার ক্ষমতা আমার নেই, তবে একটা কথা জানাই, শ্রী রাজা মিত্রের চিত্রনাট্য পড়ে মনে হয়েছে, চিত্রনাট্য মূল গল্পকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। মূল গল্পের প্রতি সদপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েও রাজা তার চিত্রনাট্যের জোরে খুলনা জগত্তারিনী স্কুলের হেডপন্ডিত গুরুদাস ভট্টাচার্যের সংগ্রামকে আরো গভীর ভাবে আমাদের সমানে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই সৃষ্টির জন্য আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে শ্রী রাজা মিত্রকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করবো অগামী দিনেও রাজা মিত্রের শিল্পকর্মের মধ্যে আমরা মানুষের জীবন সংগ্রামের ছবি খুঁজে পাবো।

আজকের চিঠি শেষ করার আগে সম্পাদক পার্থকে আর একবার বাহাবা দেবো শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারটির জন্য। সাক্ষাৎকারটি পড়তে পড়তে কখনো মনে হয়নি তথাকথিত সাক্ষাৎকার পড়ছি। শ্রী চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীলভাবে ওর ভাবনাটা প্রকাশ করেছেন। একজন বড় মাপের শিল্পীর, চিত্রপরিচালক ও ছবির ওপর এই ধরণের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা খুবই মনোগ্রাহী। পর্বান্তর-এর যাত্রা শুভ হোক। প্রতি সংখ্যাতেই জীবনের ছবি যেন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় এই কামনাই করবো। শুভেচ্ছা সহ—

পাটলীপুত্র কলোনী, পাটনা। উদয়ন ঘোষ

□

শ্রী শাহাযাদ ফিরদাউস,
C/o পর্বান্তর,

'পর্বান্তরে' 'ব্যাস উপন্যাসটি পড়লাম। ইদানিংকালে এমন বিশ্লেষণমূলক, মার্জিত ভাষা এবং লেখার আন্তরিকতা আমার পঠিত কোন বইতে দৃষ্টিগোচর

হয় নাই। আগে আমি অনেক বই পড়েছি, কিন্তু এমন সুন্দরভাবে মনকে আকৃষ্ট করেনি। বৃহৎ মহাভারত যে স্থূলভাবে মহর্ষিদের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছে, তাথেকে এমন পরিচ্ছন্ন সুচিন্তিত আখ্যান প্রকাশ করা সত্যই অপূর্ব্ব।

কলকাতা ২৩.১.৯৪ মাধুরী সেন

□

সম্পাদক পর্বান্তর,

এই উপন্যাসটি পড়ে মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের জীবন সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য জানতে পারলাম। শুধুমাত্র কঠোর তপস্যা ও পুঁথিগত বিদ্যায় আবদ্ধ না থেকে সাধারণ মাটির মানুষের সাথে মিশে জীবনকে জানবার ও বোঝবার যে চেষ্টা ব্যাসদেব করেছিলেন তা এখানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া সাধারন মানুষদের জীবনযাত্রা, সন্ন্যাসীদের তপস্যা ও বিদ্যাশিক্ষা, বংশরক্ষা ও সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদের মানুষদের বিচিত্র জীবনযাত্রা আবার সেই বংশের বিনাশের জন্য ব্যাসদেবের যে মানসিক অবস্থা তা লেখক এখানে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। ব্যাসদেবের সাথে মহর্ষি চার্বাকের সাক্ষাৎ এবং এই দুই সন্ন্যাসীর পৃথক জীবনদর্শন, ছোট বড় নানা চরিত্রের মানসিক সংঘাত, বিশ্লেষণ বইটিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। নানাদিক থেকে তাই 'পর্বান্তরে' 'ব্যাস' উপন্যাসটি নতুনত্বের দাবি রাখে।

মালঞ্চ-মাহিনগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা দীপ্তি সেন

□

মাননীয় সম্পাদক,

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস মহাশয়ের 'ব্যাস' নামে আগে-চিত্রনাট্য-পরে-উপন্যাস রচনায় 'শ্রম'কে 'প্রজ্ঞা'র পরিপূরকরূপে দেখতে পেয়ে মহাকাব্য মহাভারতের লোকায়ত দিকটি আমার কাছে নূতনতর অনুভূতিতে ধরা পড়ল। প্রাসঙ্গিকভাবে লেখক ও পর্বান্তর'কে পাঠকবর্গের তরফে বাড়তি অভিনন্দন জানাই একইসাথে সুকুমারী ভট্টাচার্যের মূল্যবান মূল্যায়নটি গ্রথিত করায়।

লেখক যে স্বতঃস্ফূর্ততায় ব্যাসদেবকে সাধারণ মানুষের সরল জীবনযাত্রা ও তাঁদের সরলতম জীবনবোধের মুখোমুখি করেছেন তা এককথায় অনবদ্য। সম্ভবতঃ এই কারণেই চার্বাকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যাসদেবের মনন-জগতে 'প্রজ্ঞা' ও 'শ্রম' সম্পর্কিত যে দ্বন্দ্ব ধরা হয়েছে তা কখনো কৃত্রিম মনে হয়নি। বরং প্রতিটি অধ্যায়ে ব্যাসদেবকে ক্রমবিবর্তিত করা হয়েছে লোকায়ত ধারাটিকে

পরিমিত গুরুত্ব দিয়ে যাতে করে শেষাবধি মহর্ষির মহত্বগুণ বজায় থেকেছে। কিন্তু ভরত বংশ রক্ষার্থে সত্যবতীর আদেশ পালনে ব্যাসদেবকে শুধুমাত্র পরম নিষ্ঠাবান এবং প্রাজ্ঞ করেই দেখা হয়েছে তাঁকে লৌকিক আঙ্গিকে দেখানো হয়নি। ব্যাসদেবের চরিত্রের এই নাটকীয়তা ব্যাখ্যার দাবী করতে পারে কী? প্রতিক্রিয়া পেতে উৎসাহী পাঠক—

বিষ্ণুপুর / বাঁকুড়া — শ্রী প্রশান্ত চ্যাটার্জী

পুনঃ—'পর্বান্তর' চেতনার জগতে নাড়া দিয়েছে এবং আশা ভবিষ্যতেও দেবে। আমি 'ব্যাস' সংখ্যাটির একটি কপি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতে চাই। ডাকমাধ্যমে কীভাবে পেতে পারি জানালে বাধিত থাকবো।

□

প্রিয় পার্থবাবু,

মনে হয় ৩/৯/৯৩ এ পাঠানো আমার চিঠি পান নি। বন্ধুবর ডাঃ স্বরূপ দত্তের কাছ থেকে হঠাৎ একদিন আপনাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পর্বান্তর' (জুলাই '৯৩) পেয়ে 'ব্যাস' পড়ে চমকে উঠলাম। লেখক শাহযাদ ফিরদাউসকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আকারে বৃহৎ বলে যে 'মহাভরত' নিজে পড়তে ভয় পাই, মাত্র ৮০ পৃষ্ঠায় এই ক্ষুদ্র মহাভারত পড়ে জনে জনে পড়াতে সাহস পেয়ে যাই। 'দুধ মেরে ক্ষীর' বোধ হয় একেই বলে। অক্ষমেরা যেখানে দুধের পরিমাণ কম হলে ফেনা দিয়ে ভরিয়ে দেন সেখানে লেখক ফিরদাউস অল্প দুধেই সঠিক পরিমাণ খাদ্যগুন বজায় রাখতে পেরেছেন—এখানেই তাঁর মুন্সিয়ানা। লেখার ধরন, স্বকীয়তা, ঋজুতা, দ্বান্দ্বিকতা—এক কথায় অনবদ্য।

ভবিষ্যতে তিনি যে একজন আমাদের গর্বের লেখক হয়ে উঠবেন, এ বিশ্বাস নিশ্চিত। আমি তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিচ্ছন্ন পত্রিকা উপহার দেবার জন্যে পর্বান্তরের শিল্পীদের প্রতিটি পর্বে আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতি সংখ্যা By post এ আমার ঠিকানায় পাঠালে খুশি হবো।

রাণীসাগর, বর্ধমান। — ললিত কোনার

□

মাননীয় সম্পাদক সমীপেষু,

'পর্বান্তর' প্রকাশনার জন্য প্রথমেই আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

শাহ্‌যাদ ফিরদাউসের 'ব্যাস' সহ পর্বান্তরের আবির্ভাব একটি ঘটনা। এর গুরুত্ব ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমি বলতে পারি 'ব্যাস' পড়ে আমি অভিভূত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের আদি স্রষ্টা ধ্যানঋদ্ধ ব্যাস যেন মূর্ত হলেন 'ব্যাস'-এ। আমরা—ব্যাস, লেখক ও পাঠকরা উত্তরণের প্রতিটি ধাপ যেন একই সঙ্গে পেরুলাম। যন্ত্রণায় বিদ্ধ হলাম। অবশেষে ব্যাস আরম্ভ করলেন তাঁর সৃষ্টি। মহৎ প্রবৃত্ত হলেন মহত্ত্বের সাধনায়। লেখক শাহ্‌যাদ ফিরদাউস তাঁর দায় সুসম্পন্ন করলেন। আর আমাদের বোধ আলোড়িত হয়ে চলল।

'ব্যাস' আমার এত ভাল লেগেছে তার প্রধান কারণ এর মধ্যে পেয়ে গেছি বিশাল দর্শনশাস্ত্র সম্ভারের নির্যাস, অতি স্বল্প আয়তনে ও যুক্তিসঙ্গত পারম্পর্যে। ভাষার নির্ভর চলনে পাঠক হিসেবে স্বচ্ছন্দ থেকেছি শেষ পর্যন্ত।

শুধু বলব শেষটা একটু বিলম্বিত হলে ও মহাকাব্যের সূচনাস্বরূপ ব্যাসের কণ্ঠে কয়েকটি শ্লোক উচ্চারিত হলে আরও তৃপ্ত হতাম।

পর্বান্তরের দ্বিতীয় সংখ্যাটি রাজা মিত্রর সংখ্যা বলা যায়। বুদ্ধদেব বসুর মূল গল্প 'একটি জীবন' ও রাজা মিত্রর চিত্রনাট্য 'একটি জীবন' পাশাপাশি পড়ার সুযোগ পেলাম। বুদ্ধদেব বসু যেমন অনায়াসে একটি জীবনীকে গল্পে রূপ দিয়েছেন তেমনি দক্ষতায় রাজা মিত্র গল্পকে দিয়েছেন চিত্রনাট্যরূপ। লেখকের মূল ভাবটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি বহু ক্ষেত্রে এনেছেন মৌলিকত্ব। তাঁর চিত্রনাট্যে আমরা দেখেছি একটি শব্দের জন্য গুরুদাসের আকুল অন্বেষণ, জেনেছি শব্দসৃষ্টির সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকার গুরুত্ব, বুঝেছি ব্যক্তি জীবনে একেকটি শব্দের ব্যঞ্জনার কী বিশাল ব্যাপ্তি।

পরিচালক রাজা মিত্র ও অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার দুটি 'একটি জীবন' ছবি নির্মাণের উপর আলোকপাত করেছে। আমরা আবারও দেখলাম একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় কত 'চেষ্টা, অপেক্ষা, ধৈর্য ও অধ্যাবসায়'-এ।

সবশেষে জানাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারটি সামান্য পরিমার্জিত হলে তাঁর বক্তব্য বিষয় আরও গুরুত্ব পেত।

সুসাহিত্য পরিবেশনের যে দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন তা পালনে আপনারা সফল হোন এই কামনা করি। নমস্কার জানবেন। ইতি

গান্ধী কলোনী, ক'লকাতা। সন্ধ্যা সাহা

□

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

হঠাৎ হাত ফেরতা হয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা "পর্বান্তর" নিজের হাতে পেলাম। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। কয়েকমাস আগে T. V.-তে একটি জীবন দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভাল লাগল আপনার পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গী। অন্যের সংখ্যাটি সে নিয়ে চলে গেছে। আপনার নিকট আবেদন ১ম, ২য়, এবং ৩য় সংখ্যাটি যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে ডাকযোগে V P. তে প্রতি সংখ্যার দুটি করে কপি (কাছে থাকলে) দয়া করে পাঠান। প্রসঙ্গতঃ জানাই, আমি একজন নাট্যকর্মী। রচনা পরিচালনা করার দুটো সুযোগই পেয়েছি মফঃস্বল নাট্যকর্মের তাগিদে। বেশ কয়েকজন নাট্যকর্মী, (মালদা সংলগ্ন অঞ্চলের) সকলে এই পত্রিকাটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে আমাকে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেছেন। সিউড়ী থেকে প্রকাশিত নাট্য পত্রিকা "অনন্যায়ুধ" এবং গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় আমি নাট্যসংবাদ, সমালোচনা এবং প্রবন্ধাদি লিখে থাকি। বিশেষতঃ গল্প থেকে নাটারূপ দেওয়ার কাজে দ্বিতীয় সংখ্যাটি উদাহরনের মত কাজে লাগতে পারে। কারণ একটি জীবন গল্পটিকে চিত্রনাট্যকার রাজা মিত্র অদ্ভুতভাবে Improvisation করেছেন। যা নিদর্শন হিসাবে কাছে থাকা দরকার। আর একটি কথা, অবাক লেগেছে—পত্রিকাটি নিজস্বতায় সম্পূর্ণ সতন্ত্র। দরকার এমন ভাবনার। বড় একঘেয়ে সকল সাহিত্য পত্রিকা। বিশ্লেষণী মনোভাব নাটকের কাজে অতি জরুরী। তাই আপনার পত্রিকা আমাদের সাথী। শুভেচ্ছাসহ।

ফারাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ। শ্রী দুলাল চক্রবর্ত্তী

□

মহাশয়,

ফিরদাউসদা আমাকে 'পর্বান্তর' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা এবং পরে প্রথম সংখ্যা পড়তে দেন।

'একটি জীবন' গল্প ও তার চিত্রনাট্য একসঙ্গে পাওয়ায় গল্প থেকে চিত্রনাট্যে

রূপান্তরের কিছুটা ধারণা পেলাম। গল্পটা খুব ভালো লেগেছে। আরো ভালো লেগেছে শ্রীযুক্ত রাজা মিত্রের চিত্রনাট্যারূপ। কিন্তু আমার অনভিজ্ঞ কলম চালানোয় ঠিক মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছি না। চিত্রনাট্যে 'গুরুদাস' চরিত্রকে আরো স্পষ্ট করে, আরো কাছ থেকে, আরো উজ্জ্বলভাবে পেলাম, ঘটনাগুলোকে আরো বাস্তব বলে মনে হলো। আমি আগেও 'একটি জীবন' ছবি দেখেছিলাম। এখন চিত্রনাট্য পাঠের পর, এই নতুন দৃষ্টিতে ছবিটা দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি।

ফিরদৌসদার 'ব্যাস' উপন্যাস পড়ার আগেই দ্বিতীয় সংখ্যার চিঠিগুলো পড়া হয়ে গিয়েছিল। তাই 'ব্যাস' সম্পর্কে বেশ কৌতুহল নিয়ে পড়া শুরু করি। বলা বাহুল্য, খুব ভালো লেগেছে। 'মহাভারত' ঘটনাবহুল কাব্যগ্রন্থ। ব্যাসদেব চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে লেখক এই কাব্যগ্রন্থের বহু ঘটনা বর্ণনা করলেও উপন্যাসটি এক নূতন রূপ, নিজস্ব পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা নিয়ে ফুটে উঠেছে। সমগ্র উপন্যাসটি ভালো লাগলেও সতেরো ও উনিশ পরিচ্ছেদ আমাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছে। আবার, একত্রিশ পরিচ্ছেদে চরিত্রগুলোর কথোপকথন না হয়ে বর্ণনা হলে আরো সুন্দর হ'তো বলে মনে হলো।

সুকুমারী দেবীর 'ব্যাস' সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক লেখা এবং দ্বিতীয় সংখ্যার চিঠি-গুলো পড়েও ভালো লাগলো।

বর্তমানে সব বিষয়ের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভালো-মন্দ মিশিয়ে এমনভাবে একাকার হয়ে আছে যে, এর মধ্যে থেকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর শিক্ষামূলক রচনা বেছে পাঠ করা অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও কঠিন। আর আমাদের মতো অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে তা উদ্ধার করা প্রায় দুঃসাধ্য। 'পর্বান্তর' পত্রিকার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের রচনার সহিত পরিচিত হচ্ছি, সে জন্যে বিশেষ করে ফিরদৌসদাকে, এবং আপনাদের, এই পত্রিকার স্রষ্টাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আশা রাখি, ভবিষ্যতে আরো ভালো, সুন্দর, শিক্ষামূলক, সর্বাঙ্গিন সুন্দর শিক্ষামূলক রচনা পাঠের সুযোগ পাবো।

ধন্যবাদান্তে—

ক'লকাতা

রঞ্জন কুমার সরখেল

নির্বাচিত গান

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

With best compliments From :-

MACHINO (INDIA) PVT. LTD.

Structural Fabricators ☐ Erectors ☐ Installation Engineers, Specialised in Pipe-Work Engineering of C.I., C.S, S.S., FRP, FRP/PVC & HDPE Pipes, Transporters and Bulk Handling Contractors.

City Office

6/1, N. S. C. ROAD

CALCUTTA-700 040

Phone : 76-2341

Factory :

RAMCHANDRAPUR,

P.O. NARENDRAPUR-743508

24 PARGANAS (SOUTH)

Haldia Office

SHED NO. 14, INDUSTRIAL ESTATE

DURGACHAK, HALDIA

Phone : 2294

আমরা ধানকাটার গান গাই আমরা লোহা পেটার গান গাই
আমরা গান গাই
আমরা রামরহিম সর্দার সারছি যার যা কাজকারবার
এমনি দিন ভোর
হয়ত সাঁঝবেলায় তারপর জমছে আটচালায় মজলিস
কিংবা চুপচাপ
ভাবছি বীজ বোনার দিন কাল, ভাবছি কারখানার রোশনাই
আজ তো ঝলমল।

কখন তাও মুখের ভাত নেই, কখন তাও চোখের ঘুম নেই
জব্দ ধনপ্রাণ
আসছে দল-বেদল লোকজন, বলছে সেই সুখের দিন নেই
বলছে দিন নেই।
বাজছে কড়া শিকল পায়ে পায়ে, চাপছে ঋণ বোঝাই থরথর
কাঁপছে হাত পাও
সামনে ঘোর মড়ক, মুশকিল...বাঁচবো—জোর কোথায়
জোর কই? রাত তো থমথম

আমরা তাঁত চালাই, গান গাই, আমরা প্রাণ বাঁচাই
বাঁচবার চেষ্টা করবোই
ভাঙবো এই শিকল গাঁয়ে গাঁয়ে, গড়বো নয়া শহর
বাঁচবার চেষ্টা করবোই
কখন বোম্বাইয়ের পথঘাট, কখন কলকাতার ময়দান
রক্তে থৈ থৈ
আজকে জোর কদম—চল চল অমনি হাত মেলাই ভাই
অমনি গান গাই।

কবিতা ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
১৯৫৪ সুর ঃ প্র. মু.

২.

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে,
কৃষাণের বউ পইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখিবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে,
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?

চোর-ডাকাতে মুখোশ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল ঢাকে কালো কানায়।
মরিয়া যত রানীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক-পূজা নরবলিতে জানায়।

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভাইয়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান।

কবিতা ঃ বিষ্ণু দে
১৯৫৫-৫৬ সুর ঃ প্র. মু.

৩.

কিসের ভয় সাহসী মন লাল ফৌজের লাফিয়ে হই পার
থাক না হাজার অযুত বাধা দীর্ঘ দূর যাত্রার।
কিসের ভয় কিসের ভয়
হাজার পাহাড় লক্ষ নদী কিছুই নেই ভাবার
শিখর পাঁচ যেন বুঝি ছোট্ট নদী ঢেউ বাহার (ঢেউ বাহার)
উমুং পাহাড় মাটির টিলা, কি সবুজ আহা লাফিয়ে হই পার
আকাশ ছোঁয়া পাহাড় আগুন আঘাত হানে, সোনালী স্রোত যার
লোহার সাঁকো টাটুর বুকে হিমশীতল পথেই হই পার
তুষার ঝরে, নিযুত শিখর রোদে ঝলমল মিন পাহাড়
মিন পাহাড়
মিন পাহাড় লাফিয়ে পার লাল ফৌজ আহা, হাসির মেজাজ সবার

কবিতা : মাও সে তুঙ
১৯৬৮ অনুবাদ : কমলেশ সেন
সুর : প্র. মু.

৪.

চেয়ে দেখ আজ
ভারতের গ্রামে গ্রামে মুক্তির সংগ্রামে
লাখো লাখো কিষাণ আসছে
ঝড় আসছে ঝড় আসছে
কিষাণ বিদ্রোহের ঝড় আসছে
শত বাধা দূরে ঠেলে জীর্ণকে ছুঁড়ে ফেলে
প্রচণ্ড ঘূর্নি তুফান আসছে।

মারমুখী হয়ে আজ জঙ্গী কিষাণ
ভাঙে বন্দীকারা ওড়ে রক্ত নিশান—
মুছে দিতে শোষণের শেষ চিহ্ন আজ
জেগে ওঠে লক্ষ মরণজয়ী প্রাণ।

দিন আসছে দিন আসছে
অত্যাচারীর শেষ দিন আসছে—
বিপ্লবী সাথীদের কাছে তাই কিষাণের
সংগ্রামী আহ্বান আসছে—

বন্ধু কোরোনা দেরি উত্তর দাও
আজ বলতে হবেই তুমি কোন পথ চাও
আমাদের সাথে থেকে শক্তি জোগাবে নাকি
শুরু হবে চীৎকার—থামাও থামাও!

থামবেনা সংগ্রাম যে যাই জানুক
মরিয়া শত্রু যত আঘাত হানুক
শঙ্কিত নয় আর জঙ্গী কিষাণ
আছে বন্দুক বল্লম তীর ধনুক।

ঢেউ আসছে ঢেউ আসছে
বিপ্লবী চেতনার ঢেউ আসছে
শোষণের বাঁধ ভাঙে জলহারা মরা গাঙে
উদ্দাম জীবনের বান আসছে।

অনুপ্রেরণা : মাও সে তুঙ
কথা ও সুর : প্র. মু

১৯৬৮-৬৯

৫.

জন্মিলে মরিতে হবে রে জানে ত সবাই—
তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাইরে
সব মরণ নয় সমান।

রক্তচোষার উশকানিতে জনতার দুশমনিতে
সারা জনম গেলে কেটে মরণ যদি আসে—
ওরে সেই মরণের ভার দেখে ভাই পাখির পালক হাসে রে
সব মরণ নয় সমান।

জীবন উৎসর্গ করে সবহারা জনতার তরে
মরণ যদি হয়—
ওরে তাহার ভারে হার মানে ওই পাহাড় হিমালয় রে
সব মরণ নয় সমান।

অনুপ্রেরণা ঃ মাও সে তুঙ
১৯৬৯ কথা ও সুর ঃ প্র. মু,

৬.

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি, সেদিন সুদূর নয় আর ।
দেখ লাল সূর্যের আলোয় লাল পূর্বসমুদ্রের পার।
সে আলো ছড়ায় দিক্‌বিদিকে, কেটে যায় রাতের আঁধার।

লাল সূর্যের আলোকধারায় করবে মাতৃভূমি মুক্তিস্নান।
উঠবে গেয়ে মুক্তির গান যুগ-যুগ নিপীড়িত
মজুর কিষাণ—
উড়বে হাওয়ায় আকাশ-ছোঁয়া গৌরব-উজ্জ্বল
রক্ত নিশান।

সেই আলোভরা দিন আনতে হবেই,
ঢালো কমরেড, সব শক্তি তোমার,
মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি, সেদিন সুদূর নয় আর
মহান্ ভারতের জনতা মহান্ ভারত হবেই জনতার।

অনুপ্রেরণা : চারু মজুমদার
১৯৬৯ কথা ও সুর : প্র. মু.

৭.

এই তপ্ত অশ্রু দিক শক্তি
এই শোকের আগুন জ্বালাক দ্বিগুণ
চিরশত্রুর পরে ঘৃণার আগুন
জ্বলুক জ্বলুক দাবানল।
দাবানল জ্বলুক দাবানল—
দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ুক
বিপ্লবের দাবানল ।

শোনো শহীদের ডাক সাহসী হও
সংগ্রামের পথে সাহসী হও
হাজার বাধার মুখে সাহসী হও
আত্মত্যাগের পথে সাহসী হও
উন্নতশির চল জয়যাত্রায়
হও মুক্তিপণে অবিচল।
দাবানল জ্বলুক দাবানল।

সামনে মোদের কত বীর শহীদ
মুক্তিযুদ্ধে দিল জীবন বলি
এস তাদের পতাকা তুলে উর্ধ্বে তাদেরই
রক্তচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলি

শোনো শহীদের ডাক সাহসী হও
সংগ্রামের পথে সাহসী হও
হাজার বাধার মুখে সাহসী হও
আত্মত্যাগের পথে সাহসী হও
উন্নতশির চল জয়যাত্রায়
হও মুক্তিপণে অবিচল
দাবানল জ্বলুক দাবানল।

অনুপ্রেরণা : থাকিন থান টুন
মাও সে তুঙ
কথা ও সুর : প্র. মু.

১৯৬৮-৬৯

৮.

শুন শুন সর্বজন শুন মন দিয়া
মোদের কাছে যাওরে ভাই এক কাহিনী শুনিয়া
অনেকদিন পূর্বের কথা উত্তরের দেশে
যে দেশে পাহাড়ের মাথা আসমানে মেশে।
সেই দেশেতে ছিলরে এক বোকা বুড়ার বাসা
বুড়ার মাথা ভরা পাকা চুল চক্ষু ভাসা ভাসা
বোকা বুড়ার কথা শুন রে।

কী যে তার নাম তাহা মনে নাহি থাকে
সবাই তারে পাহাড়ের বোকা বুড়া ডাকে।
বুড়ার ছোট্ট ঘর তার দুয়ার দক্ষিণ পানে
তবু মনে সুখ নাই বুড়ার শুন কি কারণে।
বোকা বুড়ার কথা শুন রে।

সুমুখে তিনদিকে তিন প্রকাণ্ড পাহাড়
আলো-বাতাস ঢুকে না যে ঘরেতে তাহার।
পথের উপর পাহাড় কোথাও যাইতে বড় কষ্ট
তিন পাহাড় বুড়ার সুখ করিল যে নষ্ট।
বোকা বুড়ার কথা শুন রে।

একদিন বোকা বুড়া বেটাদের বলে
এমন কষ্ট সহ্য করা আর নাহি চলে।
দেহে মোদের বল আছে হাতে নিই শাবল
শাবল হানিয়া ওই পাহাড় সরাই চল—।
বোকা বুড়ার কথা শুন রে।

কপালে হাত দিয়া মোরা আছি কি কারণ
পাহাড় সরাইব এই করিলাম পণ
দিবা নাই রাত্র নাই পিতাপুত্র সবে
শাবল দিয়া খুঁড়ে পাহাড় ঘং ঘং রবে'
পাহাড় ঘং ঘং রবে
বোকা বুড়ার কাণ্ড দেখরে।

সেই দেশেতে ছিল (রে) এক বুদ্ধিমান বুড়া
রাজ্যের বিদ্যার কথায় ভরা তার মুড়া।
বিজ্ঞ বুড়া পাকা দাড়ি নাড়াইয়া বলে
এমন পাগলামি দেখি নাই কোনকালে
চাহিয়া দেখরে বুড়া কি উচ্চ পাহাড়
শাবল দিয়া খুঁড়িয়া কি করিবে তাহার?
আর কতদিন বন্ধু যে কয়দিন আছ
নাকে তেল দিয়া দিব্য ঘুমাইয়া বাঁচ।
তিন পাহাড় যেমন ছিল তেমনই থাকিবে
নিষ্ফল কার্যেতে কেন পরাণখানি দিবে?
এই কথা শুনিয়া তারে বোকা বুড়া কয়
তোমার বুদ্ধি তোমার কাছেই থাকুক মহাশয়
বোকা বুড়ার কথা শুন রে।

সরিবে পাহাড় আমার রয়েছে বিশ্বাস
এ কাজেই যাউক আমার শেষের নিঃশ্বাস।
আমি না থাকিলে আমার বেটারা ত' আছে
শাবল থাকিবে ঠিকই তাহাদের কাছে।
আসিবে তাহাদের পরে তাহাদের বেটা
মরিলে ফুরায় কাম এমন বলে কেটা।
বোকা বুড়ার কথা শুন রে।

যতই উচ্চ হোক নাক ওই তিন পাহাড়
উহা হইতে উচ্চ কভু হবে নাতো আর।
মোর ঘটে আছে ভাই এইটুকু বুদ্ধি
এ পাহাড়ের হবে ক্ষয় হবে নাত বৃদ্ধি।
তার উপরে যদি মোরা করিহে খনন
অবশ্য হইবে তিন পাহাড়ের পতন।
আরম্ভ করিলে তবে বুঝা যায় কাম
না করিলে শুধুই তর্ক চলে অবিরাম।
অনেক কথা হইল মিতা তর্কে কিবা ফল,
এত বলি বুড়া ফের ধরিল শাবল।
বোকা বুড়ার কাণ্ড দেখ রে।

কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ দেয় গালি
ভুরুক্ষেপ না করে বুড়া, কাজ করে খালি।
রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়-শীত বাধা কত আর
গোয়ার বুড়ার একপণ সরাইব পাহাড়।
বোকা বুড়ার কাণ্ড দেখ রে।

বুড়ার নিষ্ঠায় তুষ্ট হইল ভগবান্
প্রিয় তিন দেবদূত পাঠায় সেইখান।
দেবদূত যবে বুড়ার সাথে কাজে হাত লাগায়
নিমেষে দেখ ওই পাহাড় হাওয়ায় মিলায়।
পাহাড় হাওয়ায় মিলায়
বোকা বুড়ার হাসি দেখ রে
পাহাড় সরায় বোকা বুড়া কাহিনী প্রায় শেষে
সেই চোখে চাহিয়া দেখ নিজেদের দেশ।
মোদের দেশের দশা দেখরে।

তিন পাহাড় রয়েছে মোদের দেশের উপরে
যে পাহাড় আমাদের শ্বাস চেপে ধরে।
এক নম্বর পাহাড় ওই বিদেশী শয়তান
ভিক্ষা দেবার ছলে লোটে দেশের ধনমান।
দেশের সরকারের কথা কি বলিব আর;
বিদেশী শয়তানের সে যে হুকুমবরদার।
মোদের দেশের দশা দেখরে।

বিদেশী শয়তানের যারা মুৎসুদ্দি দালাল
প্রভুর কথায় দেশের গরীব করিছে হালাল।
মজুর না মরিলে হয় যাদের বড় ক্ষতি
দুই নম্বর পাহাড় ওই দালাল ধনপতি।
মোদের দেশের দশা দেখরে।
আর যে পাহাড় তার গ্রামে অধিষ্ঠান
সহজে করিতে পার তারে অনুমান।
জোতদার জমিদার গ্রামের সামন্তের দল,
কিষাণের কেড়ে নেয় শেষের সম্বল।

হাসিমুখে মনের সুখে করে অত্যাচার।
কিষাণের হাড় গুড়া করি জমিতে দেয় সার
মোদের দেশের দশা দেখরে।

তিন পাহাড় মোদের দেশে বড়ই আপোসে
জনতার বাঁচার পথ আগুলিয়া বসে।
বিপ্লবের দল মোদের গল্পের বোকা বুড়া।
যে বুড়া নামাইতে চাই পাহাড়ের চুড়া।
বাঁচার পথের দিশা দেখরে।

দেখ সবার সমুখে আছে গ্রামের পাহাড়
প্রথমে ঘটাইতে হবে পতন তাহার।
এই কথা বলিয়া মোদের বিপ্লবের দল
গ্রামের চাষীদের সাথে ধরেছে শাবল।
নকশালবাড়ি শ্রীকাকুলাম, ভাতিন্দা মুশাহারি
সামন্তের পাহাড়ে পড়ে শাবলের বাড়ি
পড়ে শাবলের বাড়ি।
ডেবরা-গোপীবল্লভপুর লখিমপুর খেরি
ধ্বসিছে সামন্ত পাহাড় আর নাই দেরি—
রে ভাই আর নাই দেরি।
বাঁচার পথের দিশা দেখরে।

এদেশেও নাই ভাই বিজ্ঞের অভাব
কাজেতে বাগড়া দেওয়া যাদের স্বভাব।
সেই কথা না শুনে দল কাজে দেয় মন।
এক লক্ষ্য তাহাদের পাহাড়ের পতন।
কাজ যদি করে তারা বিপদে না ডরে
তুষ্ঠ হইবেন ভগবান তাহাদের পরে।
ভাগবান আমাদের কেষ্টবিষ্টু নন
জনগণই ভগবান সর্বশক্তিমান।
জনশক্তি মহাশক্তি যদি থাকে সাথে
গুড়াইবে পাহাড় আর না থাকিবে পথে।
বাঁচার পথের দিশা দেখ রে।

লড়াকু বিপ্লবের দল আর জনতা যদি মেশে
দুশমনের তাকৎ আর রবেনা এ দেশে।
যদি বল এমন কথা শুনি নাই কোথাও
এই কথাই শিখালেন মোদের সভাপতি মাও
মোদের সভাপতি মাও।

জনতার নেতা মাও-সে-তুঙ দেশ মহাচীন
যে দেশেতে তিন পাহাড় হয়েছে বিলীন
পাহাড় হয়েছে বিলীন।
সবহারা জনতার রাজ বসেছে সেখানে
তাই দুনিয়ার সবহারা তারে নেতা বলে মানে
তারে নেতা বলে মানে।

জীবনভর লড়াই করে দুশমনের সাথে
জানেন তিনি কত শক্তি জনতার হাতে
শক্তি জনতার হাতে।
তাইত মোদের ডাক দিলেন সভাপতি মাও
সামন্তের পাহাড়ে মারো শাবলের ঘাও
মারো শাবলের ঘাও।

যদি ধুলায় মিশাইতে পার গ্রামের পাহাড়
আর দুই পাহাড়ের তাকত থাকিবে না আর
একবার যে পাহাড়ের জমিন হয়েছে নড়বড়ে
আঘাত হানিলে সে আর কত দিন লড়ে।
সরিবে কালাপাহাড় আসিবে বাতাস
উদিবে নূতন সূর্য হাসিবে আকাশ।
পূব গগনে নূতন সূর্য উদয়ের তরে
আজ নকশালবাড়ি শ্রীকাকুলামে কিষাণ লড়াই করে।

বোকা বুড়ার কাহিনী যে হইল সমাপন
বল বিপ্লবের হোক জয়, জয় জনগণ।

১৯৬৯

অনুপ্রেরণা ঃ মাও সে তুঙ
কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

৯.

লড়াই কর লড়াই কর লড়াই কর লড়াই
যতদিন না বিজয়ী হও
যদি একবার হারো বারবার লড় বারবার লড় বারবার
যতদিন না বিজয়ী হও
কিসের ভয় হবেই জয় দূর করে ফেল যত সংশয়
আবার তৈরী হও।

এই ত যুক্তি জনগণের
এ পথে মুক্তি জনগণের
অমিত শক্তি জনগণের
তুমি ত তাদেরই একজন
তুমি একাকী কখনও নও।

তাদের সঙ্গে এক হয়ে আজ মুক্তি শপথ নাও—
যুদ্ধে সামিল হও আজ এই যুদ্ধে সামিল হও।

১৯৬৯

অনুপ্রেরণা ঃ মাও সে তুঙ
কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

মাগো আমার মরতে এখন এতটুকু ইচ্ছে করে না
মাগো আমার মরতে এখন ইচ্ছে করে না।

একটি হেলিকপ্টার ওড়ে, ছায়া জলে ভাসে
আকাশ থেকে দেবতা কি খাবার দিতে আসে
হায়রে চলে যাচ্ছে বুঝি দেবতাদের পাখি
এসো মাগো তাড়াতাড়ি দু-হাত তুলে ডাকি।
তোমার ছোট মেয়ে যে আর খিদে সইতে পারে না

ছেঁড়া ন্যাকড়ার সেই যে পুতুল বুকের বনমালা
বানের জলে ভাসিয়ে দিলাম পরাণ ফালাফালা,
আমিও তো মা তোমার পুতুল আমায় ধরে রাখো—
ঘুমে যদি জড়ায় ও চোখ তবুও জেগে থাক
তোমার পুতুল আমার মতো জলে ভাসিয়ে দিও না।

শরীর যে আর বয়না মাগো কখন যাবে ঘরে
বুকে রেখেও বুঝছ না কি, কাঁপছি আমি জ্বরে
চোখের জলে পুড়ছি সারাজীবন পোড়ো তুমি
কোটি কোটি মানুষ পোড়ে, এ কার জন্মভূমি
চোখের জলে এত আগুন, চোখের জলে এত আগুন
তবু কেন সারা দেশে আগুন জ্বলে না।

কবিতা : স্নেহাকর ভট্টাচার্য
১৯৭৮ সুর : প্র. মু.

আঁসুর মাঝে হাসির ঝিলিক আনলি রে তুই কালিন্দী
মোরা যে তোর খেলার পুতুল পাগল মেয়ে কালিন্দী
তুই জান দিলি মান দিলি, জমিন দিলি কালিন্দী
তোর চরে তাই নাচি গাই মাদল বাজাই কালিন্দী
ধিতাং ধিতাং ধিতাং তাং উড়ুর উড়ুর ধিতাং তাং

পলাশবনে পাতার ফাঁকে ফুল ফুটে আহারে—
কালো মেয়ের রাঙা ঠোঁটে হাসি ফুটে আহারে
তুই ফুল দিলি ফল দিলি ফসল দিলি কালিন্দী
তোর চরে তাই নাচি গাই মাদল বাজাই কালিন্দী।
ধিতাং ধিতাং ধিতাং তাং উড়ুর উড়ুর ধিতাং তাং *

১৯৭৯ কথা ও সুর : প্র. মু.

*তারাশংকরের 'কালিন্দী' নাটকের জন্য রচিত।

১২.

কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী?
মাটি ছেনে যখন ইটের পাঁজা বানাচ্ছি
যে ইট দিয়ে তৈরী হবে তোমাদের ওই ঘর
খিদেয় ধুঁকে বইছি যখন শস্য এ বুকভর।

কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী?
মাটির তলা খুঁড়ে যখন কয়লা ওঠাচ্ছি
কাশতে কাশতে জীবন যায়, শরীরও হয় ক্ষয়
গরম ভাপে হাপর যেন চলে অন্ত্রময়।

কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী?
ভেজা জমির ওপর যখন লাঙল চালাচ্ছি—
কণামাত্র খাবার যখন পাই না খেতে নিজে
পাথর দিয়ে মূর্তি বানাই কড়া রোদের নিচে

কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী
ফুলের ডালা যখন তোমার সামনে সাজাচ্ছি
তোমাদেরই জন্য যখন কাগজ বানালাম
তার ওপরে লিখবে বলে রাম রাম রাম।

কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী
জুতোর জন্য কত জীবের মুণ্ডু খসাচ্ছি
রাঁধবে খাবে বলে বানাই থালা বাটি গ্লাস
নিজের জন্য পাইনা যখন সামান্য এক গ্রাস

কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী?
চুল কামিয়ে দিচ্ছি যখন হবে সন্ন্যাসী
ধুচ্ছি যখন ওই তোমাদের কাপড়জামার কাদা
ফিরিয়ে দিতে হবে বলে জুইয়ের মতো সাদা

না না না

তোমাদের এই ধাপ্পা বাপু চলবে না তো আর
উই খেয়েছে কুরে তোমার মনোবলের সার—
থুবড়ে পড়া হদ্দ বুড়ো ওই তোমাদের রথ-ও
নড়তে চড়তে পারে না আর চূর্ণ এবং গত।

টুকরো থেকে টুকরো আরো করতে যদি চাও
ভাবো যদি ভিন্ন করে দেবে সবার জাত
তোমাদের যে দিন ঘনাল, ভাব সেই কথাও
ঘাম ঝরিয়ে এক হয়েছি, মেলাচ্ছি সব হাত।

কবিতা ঃ চেরাবাণ্ডারাজু
১৯৮১ অনুবাদ ঃ শঙ্খ ঘোষ
সুর ঃ প্র. মু.

১৩.

আমাদের যেতে হবে দূরে বহুদূরে (যেতে হবে)
জীবনের শেখা পাঠ সাথে করে আলোর শিখায়
এসেছি এতটা দূর কাঁটাপথ মাড়িয়ে দু' পায়
যেতে হবে

যেতে হবে মার কাছে অতীত জঠর থেকে নেমে
তার কাছে আমাদের সমস্ত প্রণিপাত মেনে
যেতে হবে

আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে আঁধার জমাট
পায়ে পায়ে পাতা আছে নয়া দুশমনদের ফাঁদ
এসব গুড়িয়ে দিয়ে আমাদের যেতে হবে দূরে
যেতে হবে

আমাদের বুঝে নিতে হবে আজ এই সে সময়
সামনে ছড়িয়ে থাকা আমাদের এই পথময়
কোথাও পাবোনা কেউ এক ফোঁটা জল কোনো, তবু
যেতে হবে

আজ যা হতাশ করে সেইসব ঠেলে দিয়ে দূরে
আমাদের যেতে হবে বহু প্রতিশোধ বুকে পুরে
পৌছতে পারি যাতে আমাদের ঠিক পরিণামে
যেতে হবে।

১৯৮১
(সংক্ষিপ্ত)

কবিতা ঃ চেরাবাণ্ডারাজু
ভাষান্তর ঃ প্রদীপ গোস্বামী
সুর ঃ প্র. মু.

১৪.

আমার মাগো, তোর চোখে কেন জলের ধারা।
দুশমনে রুখিতে তোর এক পুত্র দিল প্রাণ
আজ দেখ তোরে মা বলে ডাকে হাজার সন্তান—
আমার মাগো কে বলে তুই সন্তানহারা।

ধন্য বীরমাতা বীরপুত্রগরবিনী আমার মা—
সাহসী সন্তানদের শক্তিস্বরূপিনী আমার মা—
দলে দলে আমরা মা তোর আশিস নিয়ে মাথে,
সংগ্রাম করিব হিংস্র দানবের সাথে—
আমার মাগো, আঁখি মুছে উঠে দাঁড়া।

১৯৮২ কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

১৫.

যুদ্ধকে মুছে ফেলতে চাই,
আমরা যুদ্ধে নেমেছি তাই,
বন্দুক হতে মুক্তি চাই
বন্দুক হাতে নিয়েছি তাই। যুদ্ধকে

শেকল ভাঙার করেছি পণ,
তাই শৃংখলে বেঁধেছি মন।
দু'চোখে মোদের স্বপ্ন, তাই
রুক্ষ মাটিতে নিয়েছি ঠাঁই। যুদ্ধকে ....

সুখ যে দিয়েছে হাতছানি,
দুঃখের পথ চিনেছি তাই।
দেখেছি আলোর ঝলকানি
তাই তো আঁধারে পা বাড়াই। যুদ্ধকে

ফোটাব যে ফুল রাশি রাশি,
(ফোটাবই ফুল রাশি রাশি)
ফুল খেলা আজ ভুলেছি তাই।
জীবনকে মোরা ভালবাসি,
জীবন তুচ্ছ করেছি তাই

জনতার সাথে মিলেমেশে
লড়ছি আমরা দেশে দেশে
বন্ধুর হাতে হাত মিলাই
শত্রুবিজয়ে এগিয়ে যাই। যুদ্ধকে

অনুপ্রেরণা : মাও সে তুঙ
১৯৮২ কথা ও সুর : প্র. মু.

১৬.

লাল রঙ দেখে কিছু লোক হয় ভয়েই জড়োসড়ো—
কচি কাঁচারাও বুঝি তাদের চেয়ে বড়ো।
ভয় কি লাল রঙে? আমাদের প্রিয় রঙ লাল,
আমাদের প্রিয় রঙ লাল, আমাদের প্রিয় রঙ লাল।

সূর্যের প্রথম কান্তি উজ্জ্বল রক্তিম,
সূর্যের অস্তলগ্নে লাল হয় পশ্চিম,
লাল নয় মধ্যম উত্তম মনোরম, লাল
আমাদের প্রিয় রঙ লাল, আমাদের প্রিয় রঙ লাল।

প্রকৃতির বুকে কত ফুল ফোটে লাল রঙ ধ'রে
মেয়েরা যে টিপ পরে লাল জ্বলজ্বল করে,
সুন্দর লাল রঙ আমাদের প্রিয় রঙ লাল
আমাদের প্রিয় রঙ লাল, আমাদের প্রিয় রঙ লাল।

শহরে রাস্তার মোড়ে লাল আলো যখন জ্বলে
স্তব্ধ ধনিকের গাড়ি, পদাতিক পথ চলে।
ভয় কি লাল রঙে আমাদের প্রিয় রঙ লাল
আমাদের প্রিয় রঙ লাল, আমাদের প্রিয় রঙ লাল।

লাল রঙ গরীবের কখনোই করবে না অপকার
লাল রঙ ফিরিয়ে আনছে মানুষের অধিকার
ভয় কি লাল রঙে আমাদের প্রিয় রঙ লাল
আমাদের প্রিয় রঙ লাল, আমাদের প্রিয় রঙ লাল।

মানুষের মুক্তির যুদ্ধে যারা দিল প্রাণ নির্ভয়,
তাদেরই রক্তের লাল রঙ, আমাদের সারা দেহে বয়।
তাদের প্রেমের রঙে আমাদের প্রাণ হ'ল লাল
হাতের নিশান হ'ল লাল
তাই আমাদের প্রিয় রঙ লাল।

মূল ঃ সুব্বারাও পাণিগ্রাহী
১৯৮২ অনুবাদ ঃ বোম্মানা বিশ্বনাথন
রূপান্তর ও সুর ঃ প্র, মু.

১৭.

ভয় পাসনে ছেলে ভয় পাসনে ছেলে
কেউটে কিংবা গোক্ষুর নয় ও সাপ নেহাৎ হেলে,
কামড়ে দিলে পা
(ও সাপ) কামড়ে দিলে পা
খুব জোর তো দু-চারদিনের ঘা।

আর সাহস করে ছেলে
যদি তুলতে পারিস লাঠি
দেখবি ও সাপ পায়ের কাছে
ঠাণ্ডা মেরে গুটিয়ে আছে
দিব্যি পরিপাটি।

ভয় পাসনে ছেলে ভয় পাসনে ছেলে
কেউটে কিংবা গোক্ষুর নয় ও সাপ নেহাৎ হেলে।

কবিতা ঃ পার্থ বন্দোপাধ্যায়
৩ অক্টোবর, ১৯৮২ সুর ঃ প্র. মু.

চেরাবান্ডারাজু—ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার

অঙ্কুশপুরমের অঙ্কুশ তুমি অত্যাচারীর ভয়,
চেরাবান্ডারাজু, গাহি তোমার জয়

পড়ে পড়ে মার খাওয়া মানুষের মনে
চিরদিন তোমার ঠাঁই
চেরাবান্ডারাজু ভুখা জনতার ভাই
চেরাবান্ডারাজু জঙ্গী জনতার ভাই।

ও — তোমার গানে মরা গাঙে তুলল নতুন ঢেউ,
চেরাবান্ডারাজু ভুলব না তো কেউ।

ও— গাঙের জলে কুমীর কত ভয় দেখাবে আর
মানুষমারা কুমীর জলে ভাসবে কত আর
চেরাবান্ডারাজু, ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোআর

ঢেউয়ের ঘায়ে ছোটে জল
আর ভাঙে নদীর পাড়,
চেরাবান্ডারাজু, ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোআর।

১৯৮২ কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

স্লোগান দিতে গিয়েই আমি চিনতে শিখি নতুন মানুষজন
স্লোগান দিতে গিয়েই আমি বুঝতে শিখি কে ভাই কে দুশমন।

হাট মিটিং-এ চোঙা ফুঁকেছি
গেট মিটিং-এ গলা ভেঙেছি
চিনছি শহর গ্রাম—
স্লোগান দিতে গিয়েই আমি
সবার সাথে আমার দাবী প্রকাশ্যে তুললাম।

স্লোগান দিতে দিতেই আমি
ভিড়ে গেলাম গ্যানে

গলায় তেমন সুর খেলে না
হোক বেসুরো পর্দাবিদল
মিলিয়ে দিলাম সবার সাথে
মিলিয়ে দিলাম গলা
ঘুচিয়ে দিয়ে একলষেঁড়ে চলা

জুটলো যতো আমার মত
ঘরের খেয়ে বনের ধারে
মোষ তাড়ানো উল্টোস্বভাব
মোষ তাড়ানো সহজ নাকি!
মোষের শিংয়ে মৃত্যু বাঁধা
তবুও কারা লাল নিশানে
উস্‌কে তাকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে

স্লোগান দিতে দিতেই আমি
বুঝেছি এই সার
সাবাশ যদি দিতেই হবে
সাবাশ দেবো কার
ভাঙছে যারা ভাঙবে যারা
খ্যাপা মোষের ঘাড়॥

কবিতা ঃ পার্থ বন্দোপাধ্যায়
সুর ঃ প্র. মু.

৪ নভেম্বর, ১৯৮২

২০.

পিঁপড়েকে বলে পিঁপড়েনী
আলুনি চুল বেঁধে নি
সেই বিনুনির ডগায় ফুল
কালো মেঘে বাজের দুল।

হঠাৎ এল ধেয়ে
দূর দুড়াদুড়
গুড় গুড়াগুড়
দস্যি পাড়ার ডেয়ে
লাল পিঁপড়ের বাসায়
ঢাল তলোয়ার শানায়।

ধাঁই খটাখট চরকি ভোঁ
বাজ শকুনির ঝটতি ছোঁ
লক্ষ ধড়ের মুণ্ডু নেই
লাল পিঁপড়ের কামড়েই
আয়রে পিঁপড়ে ঘরে যাই
চিনির দানা কিনে খাই,
আসবে না আর ডেঁয়ের পো
ভ্যাঁপো ভোঁপো ভোঁপো পো
(ভোঁ)

ছড়া ঃ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
সুর ঃ প্র. মু.

৩১ জানুআরি, ১৯৮৩

২১.

ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথীরে ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে
পুবের আকাশ রাঙ্গা হল সাথী ঘুমায়ো না আর, জাগোরে।
ভাসাও ডিঙ্গা সাগরে
ভাসাওরে ডিঙ্গা সাগরে

(ও) ডাঙ্গার টানে পরাণ ছিল বাঁধা
কেনরে বন্ধু এতকাল,
ছিল পরাণ বাঁধা এতকাল।
গয়জি গুমরি ডাকে শোন ওই
তরঙ্গ উথালপাথাল,
ওই তরঙ্গ উথালপাথাল।

পাল তুলে দাও, হাল ধর হাতে দুস্তর সাগর হব পার
জাগায় মাতন ঢেউয়ের নাচন মরণবাঁচন একাকার।

ডিঙ্গা ভাসাও...

এপ্রিল ১৯৮৩ কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

২২.

বলো সাথী, সবদিনই আমাদের পয়লা মে,
(বোলো সাথী, হররোজ হমারা পহেলা মঈ)।

দুনিয়ার মজদুর এক হও—এই ডাক শুনি যে দিন,
সেদিনই মে-দিন সাথী সেদিনই মে-দিন—
বলো সাথী...

মে-দিন মানেনা জাতি, রঙ হলদে শাদা-কালো,
মে-দিনের রঙ লাল, সব মজদুরকে মেলালো।
আর সইব না গোলামি, মজদুর তোলে আওয়াজ
বুলন্দ আওয়াজে কাঁপে দুনিয়ার মুনাফাবাজ—
বলো সাথী...

কী করে আজ ভুলি, সেই আট ঘণ্টার লড়াই
লড়াই তো যায়নি থেমে, পথ চড়াই উৎরাই।
শহীদের খুনে রাঙা (এই) লাল নিশাণ ওড়াই
(আর) ঠিক রেখে নিশানা
আগে কদম কদম বাড়াই—
বলো সাথী...

৪ মে, ১৯৮৩ কথা ও সুর : প্র. মু.

২৩.

সাপের মাথায় পা দিয়ে
সে নাচে
কান্না কেন কান্না কেন তোর ?
বন্যা খরা মড়ক বুকে বাঁচে,
ভাবনা কেন ভাবনা কেন তোর ?

তুই কি ভাবিস
তার ঘুমে সেই স্বপ্ন নেই ?
আছে

সাপের মাথায় পা দিয়ে
সে নাচে
কান্না কেন, কান্না কেন তোর ?

১৯৮৩

কবিতা ঃ অমিত দাস
সুর ঃ প্র. মু.

২৪.

আলু বেচো ছোলা বেচো বেচো বাখরখানি
বেচো না বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মণি
কলা বেচো কয়লা বেচো বেচো মটরদানা
বুকের জ্বালা বুকে জ্বলুক কান্না বেচো না।

ঝিঙে বেচো পাঁচসিকেতে হাজার টাকায় সোনা
বন্ধু, তোমার লালটুকটুকে স্বপ্ন বেচো না।
ঘরদোর বেচো ইচ্ছে হ'লে করবনা ত' মানা
হাতের কলম জনমদুখী তাকে বেচে না।

কবিতা ঃ সমীর রায়
৯ আগষ্ট, ১৯৮৩ গীতিরূপ ও সুর ঃ প্র. মু.

২৫.

দারুণ গভীর থেকে ডাক দাও মানুষের মা
ঘুমঘোর যেন ভেঙে যায়
আমরা ঘুমের শিশু, গাঢ় ঘুম অঙ্গে লেগেছে—
মা গো ঘুম ভেঙে দাও।

ডাকো যেন মেঘ ডেকে ওঠে
ডাকো যেন সমুদ্র গরজায়
ডাকো যেন বেজে ওঠে শাঁখ
চারিদিকে মৃত্যুর হানা
বর্গী এসেছে বলে ঘুম পাড়িও না
মাগো ঘুম ভেঙে দাও।

কবিতা ঃ রঞ্জিত গুপ্ত
সুর ঃ প্র. মু.

সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

২৬.

ভিনদেশী এক পাগল মরে না ম'লে
দেখ না একশ বছর যায় চলে।
ভিনদেশী...

কেন পড়ে পড়ে গরীবরা খায় মার
জ্ঞানসাগরের ডুবুরী যে করল ব্যাখ্যা তার।
কেন পড়ে পড়ে গরীবরা খায় মার
জ্ঞানসাগরের ডুবুরী পাগল করল ব্যাখ্যা তার।
কী করে হয় মজুর পেষাই মালিকের জাঁতাকলে
পেষাই—মালিকের জাঁতাকলে।

ভিনদেশী...

ধন আর উপকরণ আছে যার,
শ্রমের জন্য মজুর তারা করে ব্যবহার।
যা দেয়, করে ঢের বেশি আদায়,
রুটির জন্যে খাটে মজুর হয়ে নিরুপায়।
সেই কম মজুরীর গোপন চুরি মুনাফা হয় যার ফলে,
মালিকের মুনাফা হয় যার ফলে।

ভিনদেশী...

কেমন করে টেঁকে পেষাই কল
দেশের শাসনযন্ত্র মালিক করে নেয় দখল।
নড়নচড়ন হবার উপায় নেই।
শান্তি রাখতে আছে পুলিশ, আর আছে তার সেপাই।
একসাথে হয় শোষণ-শাসন যদি আসন না টলে
প্রভুদের যদি আসন না টলে।

ভিনদেশী...

এমন দশা পাগল মানে না,
শেষ না দেখে ভাবুক সার্থক থামতে জানে না।
মরিয়া হয়ে পাগল খোঁজে পথ,
বুঝল কোন নিয়মে চলে মহাকালের রথ।
তার লক্ষ্য আসল দুনিয়া বদল
(শুধুই) তত্ত্বে সত্য না মেলে।
ভিনদেশী.....

ধনপতির মাথায় পড়ে বাজ
পাগল বলে আসবে বিশ্বে সবহারাদের রাজ।
দুমিয়া জুড়ে গড়ে নতুন দল,
সেই পাগলের ভাবনা দিল দুর্বলেরে বল।
সেদিনের ছন্নছাড়া সবহারা-রা
সেদিনের ছন্নছাড়া সবহারা সব মিলল এক নিশাণ তলে।
নতুন এক লড়াইয়ের নিশাণতলে
লড়াইয়ের লালরঙা নিশাণতলে।
ভিনদেশী.....

দুনিয়ার মজদুর এক হও, হও তৈয়ার,
হাতের শেকল ছাড়া তোমার কিছু নাই তো হারাবার।
জয় করতে আছে বিশ্বখান
যুগযুগান্ত পেরিয়ে শোনো, সেই পাগলের আহ্বান।
পণ করে প্রাণ হও আগুয়ান ভয় কি তুফান বাদলে?
মজুরের ভয় কি তুফান বাদলে?
কিষাণের ভয় কি তুফান বাদলে?
জনতার ভয় কি তুফান বাদলে?*
ভিনদেশী.....

ডিসেম্বর ১৯৮৩ কথা ও সুর : প্র. মু.

*কার্ল মার্ক্স প্রয়াণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত গান।

২৭.

ঘৃণায় ত চিরদিন মুখ হয় বিকৃত
হোক সে ঘৃণা অত্যাচারের প্রতি
ক্রোধে চিরদিন ভাঙে কণ্ঠস্বর
হোক সে ক্রোধ অবিচারের উপর

চেয়েছি বিশ্বজুড়ে মহামৈত্রী
নিজেরা পাইনি আজও মৈত্রীর স্বাদ
কিন্তু তোমরা যারা আসবে নতুন যুগে
মানুষ যেদিন মানুষের দিকে বাড়াবে হাত

ক্ষমা কোরো আমাদের তোমরা সেদিন
ক্ষমা কোরো আমাদের ভুল।

মূল রচনা ঃ বেটোল্ট ব্রেখট
অনুবাদ ঃ উৎপল দত্ত
রূপান্তর ও সুর ঃ প্র. মু.

মার্চ ১৯৮৪

কুট্টুস কট্টাস মট্টর ভাজা
খাচ্ছেন নিবুচন্দ্র রাজা,
তার যে চিবুচন্দ্র মন্ত্রী
নিয়ে ফেরেন শতেক যন্ত্রী।
কোতোয়াল সে ডালিম চোখে
তালিম দিয়ে বিড়ি ফোঁকে।
সেই রাজারই জেলখানাতে
উল্লুক ভল্লুক আড়ি পাতে
চামচিকেরা চিমটি মারে
বাদুড় ঝোলে সারে সারে।
কয়েদীরা সব ফোঁসে ফাঁসে
নিবুচন্দ্র মুচকে হাসে
বাঘকে রাখি লোহার খাঁচায়
মানুষ রাখি ইটের পাঁজায়
মন্ত্রীর গোঁফে চাড়া দিয়ে
তারিফ করে মায়ে ঝিয়ে
বললেন নিবুচন্দ্রের মেসো
বিষ্যুদবারে তিনবার কেশো—
নইলে তোমার ইটের পাঁজা
হবেই সাড়ে বত্রিশ ভাজা

কোতোয়ালের মুখটি চুন
রাজার রাজ্যি ভাজার গুণ।

এপ্রিল ১৯৮৪

ছড়া ঃ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
সুর ঃ প্র. মু.

২৯.

লাল কমলা হলদে সবুজ আসমানী নীল বেগুনী
সাতরঙা আঁচল উড়িয়ে আকাশে নাচে রে—
নাচে রে কোন নাচনী ... আহা

বৃষ্টি শেষে সূর্য ফিরে আসে ঢাল বেয়ে
আকাশ পাহাড় পাহাড়ী পথ নীল—
কে বেশি নীল কার চেয়ে?

একদিন ভীষণ লড়াই হয়েছিল এই গাঁয়ে—
গুলির দাগে বীরের গাথা লেখা
দেয়ালেরই গায়ে গায়ে।

দেয়ালের সে ক্ষত
চোখে লাগছে ফুলের মত
পাহাড়, পাহাড়ী পথের বাহার দুগুণ বাড়ে তখনই···আহা।

মূল ঃ মাও সে তুঙ

নভেম্বর ১৯৮৪ গীতিরূপান্তর ও সুর ঃ প্র. মু.

ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়
যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা—
ফুটপাতে আজ লেগেছে জোছনা—
চাঁদ হেসে তার কপালে চুমু খায়
লুকিয়ে মোছেন চোখের জল মা।

কবিতা ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর ঃ প্র. মু.

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

৩১.

তোর কি কোনো তুলনা হয়?
তুই
চোখ বুঁজলে হিম সাগর,
চোখ মেললে অনন্ত নীল আকাশ।

বুকের মধ্যে সমস্ত রাত
তুষার-ঢাকা পাহাড়
সমস্ত দিন সূর্য-ওঠার নদী
তোর কি কোনো তুলনা হয়?
তুই
ঘুমের মধ্যে জলভরা মেঘ,
জাগরণে জন্মভূমির মাটি।

কবিতা ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর ঃ প্র. মু.

১ মে, ১৯৮৫

হে—হে হে—হে
ছোকরা চাঁদ জোয়ান চাঁদ হে—হে
খবর শোনাও, একটা খবর শোনাও
একটা ছোট্ট খবর তো শোনাও ভাই।
শোনাও ভাই, শোনাও ভাই হেঃ হেঃ।

যখন সূর্য উঠবে, ভোরের আলো ফুটবে
তোমায় সেই খবরটা বলতে হবে।
কী জানতে চাই? (আহা) ব্যস্ত কেন?
এখনই তা বলছি শোনো।
সূর্য উঠবে যবে কানে কানে বলে যাবে
কেমন করে কিছু খেতে পাই
কিছু খেতে পাই কিছু খেতে পাই, হেঃ হেঃ।

মূল ঃ অজ্ঞাত
মে, ১৯৮৫ অনুবাদ ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গীতিরূপান্তর ও সুর ঃ প্র. মু.

৩৩.

খাদে ঠকি কলে ঠকি, ঠকি ওই শুঁড়িখানায়,
আমরা যখন নেশায় বেহুঁশ কশাই তখন ছুরি শানায়।
ঠকি ওই শুঁড়িখানায়।

ছিটেফোঁটা হপ্তা পেলে দিচ্ছি মদের নালায় ঢেলে
নেশার ঘোরে ভুল বকি আর মালিক হাসে ঠোঁটের কাণায়।
আমরা যখন...

লড়াই লড়াই যতই বলি, যদি হই নেশার বলি
ঘুমজড়ানো চোখে কি আর লড়াইয়ের কথা মানায়?
আমরা যখন.....

ভেঙে ফেল মদের বোতল মরণ-নেশা করবে কোতল
মাতি আয় বাঁচার নেশায় রুখি দুশমনের হানায়
আমরা যখন

জুন ১৯৮৫ কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

কিবা আসে যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিষায় কালো মেঘে
শরতের রোদ মুছে নিয়ে যায় মরা শ্রাবণের মেঘে মেঘে
হেমন্তে যদি বাতাস ফোঁপায় কিংবা পঙ্গপাল আসে
অসময়ে গাঁয়ে খামারে গঞ্জে বস্তিতে বাঁকা শীত হাসে
তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, কতটুকু ক্ষতি মিতে!
এসো, তালি-দেওয়া জুতোজোড়ায় সযত্নে বাঁধি ফিতে!

কিবা আসে যায় বন্দর যদি শ্মশানের ছাই গায়ে মাখে
ঘরে ঘরে মরা শিশুর কান্না ক্ষুধিত মায়েরা মনে রাখে
কাব্যের ফাঁকে 'নেই নেই' ঢোকে, জাত-কবিদের ভাত মারে
কিংবা শিল্পী স্বপ্ন বানায় হাজার শিশুর মরা হাড়ে
আমাদের দিন বদলায় নাকো, বদলায় নাকো মিতে।
হাঁ-করা জুতোটা অবাধ্য বড়ো, ভালো করে বাঁধো ফিতে!

কিবা আসে যায় চাঁদ যদি ফেরে লজ্জায় ঘরে উঁকি দিয়ে
কড়িকাঠে ঝোলে বিবসনা নারী হবু-কবিদের ফাঁকি দিয়ে
কিংবা সাগর ফুলে ফেঁপে ওঠে, গর্জায় আর চোখ রাঙায়
উজিরের ঘুম ভাঙে অসময়ে, কোটাল সভয়ে বিদেশ যায়
আমাদের চলা এতেই কি শেষ, এতেই কি শেষ হয়?
দাঁতালো পেরেক, তালি খাওয়া জুতো অনেক কথাই কয়!

জুলাই ১৯৮৫

কবিতা ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর ঃ প্র. মু.

৩৫.

ঝিরঝির বৃষ্টিঝরা আষাঢ়ের এক দিনে
শ্মশানে আগুন দেখি আগুন নিল চিনে।
আগুন ডাকে আয়রে বীরেন, তুই ত আমার ভাই—
হাজার মানুষ দেখুক কেমন দুই-এ মিশে যাই।
তুই প্রতিবাদের রাঙা আগুন,
ভয়ের শেকল-ভাঙা আগুন,
ভালোবাসার আগুন যে তুই—
তুলনা তোর নাই।

যে আগুনে ফুটপাতে মা ফোটায় গরম ভাত,
যে আগুন জেবলে গরীব মানুষ কাটায় শীতের রাত,
সেই আগুন বরণ করতে আগুন বাড়িয়ে দেয় হাত
আগুন হ'ল আগুনময় জয় আগুনের জয়,
তার আলোয় পড়ি জন্মভূমির বর্ণপরিচয়।*

২২ জুলাই ১৯৮৫ কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

*কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে রচিত।

৩৬.

পাথরে পাথরে নাচে আগুন
আগুন হাতে দ্যাখোরে মানুষ নাচে
নাচে রাত শীত নাচে
পাথরে পাথরে নাচে,
শীতের পাহাড় নাচে
রাতের পাহাড় নাচে,
পাথরে পাথরে···

আগুনের মতো লাল
হাজার হাজার লাল পতাকা
রাতশেষের বন্দীর চোখে নাচে
দ্যাখোরে স্বপ্ন নাচে
পাথরে পাথরে....

কবিতা ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর ঃ প্র. মু,

আগস্ট ১৯৮৫

আমি এত বয়সে গাছকে বলছি
তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও
হাঃ হাঃ আমি গাছকে বলছি...

অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি
তোমার মরা খাতে পরী নাচাও
হাঃ হাঃ আমি নদীকে বলছি...

খরায় মাটি ফেটে পড়ছে
আর আমি হাঁটছি রক্তপায়ে
যদি দু একটা বীজ ভিজে ওঠে
যদি দু একটা বীজ ভিজে ওঠে
যদি দু একটা...

নিসর্গের বুকে আমি হাড় বাজাচ্ছি
আর মাদারির মতো হেঁকে বলছি
এই আওয়াজ হয়ে যাবে একমাঠ ধান
ঝিঁঝিঁ হুতোম প্যাঁচা শেয়াল
অস্থায়ী আর অন্তরায় রাত ধুনছে
আমি বলছি এক মাঠ ধান
হাঃ হাঃ

কবিতা ঃ অরুণ মিত্র
সুর ঃ প্র. মু.

সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

সুন্দরী লো সুন্দরী
কোন মুখে তোর গুণ ধরি
দিব্যি সোনার মুখ করে তুই
দুই বেলা যা খাস
ঘাস বিচালি ঘাস।
ঘাস বিচালি ঘাস।

কিন্তু মুখে জ্বলবে আলো
পদ্মাভ সংকাশ
নেই কোনো সন্ত্রাস
ত্রাস যদি কেউ বলিস তাদের
ঘটবে সর্বনাশ।

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস।

কবিতা ঃ শঙ্খ ঘোষ
২৬ অক্টোবর ১৯৮৫ সুর ঃ প্র. মু.

লখিন্দর জিয়াইবার আশে গাঙ্গুরে বেহুলা ভাসে
ভাসে ওই বেহুলার ভেলা—
বেহুলার ভেলা ভাসে।

কান্দিছে সনকা মাতা লখাই আমার গেলি কোথা
বেহুলার চোখেতে জল নাই।
দুঃখে সে হইল না কাতর শোক তারে করিল পাথর
পণ করিল জিয়াইবে লখাই॥
বেহুলার ভেলা ভাসে।

কামোট ঘোরে ভেলার পাশে মড়ার মাংসের আশে
পাড়ে কামুক দিল হাতছানি।
ভাসুক জলে মরা পতি পাড়ে আইস হে যুবতী
তোমারে করিব পাটরানী॥
বেহুলার ভেলা ভাসে।

ডুবায় জলে লাজ ঘৃণা ভয় তুচ্ছ করে লোকে কি কয়
ছাড়েনা সে মরণ জয়ের আশা।
মরণে আগুলি কোলে কালের ঢেউয়ে জীবন দোলে
এর নামই বুঝি ভালোবাসা॥
বেহুলার ভেলা ভাসে।

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

ন কোসি সিকেন্দে আফ্রিকা
জাগো মাতৃভূমি, জাগো আফ্রিকা

আমাদের হাত শিখে গেছে
ঠিকঠাক ধাতুর ব্যবহার
হাতের মুঠোয় দমবন্ধ গ্রেনেড
ফাঁসিকাঠ, গুলি আর মুক্তির ফাঁকে ফাঁকে
হুল্লোড়, হাসি আর ভালোবাসা।
ভালোবাসা
ন কোসি সিকেন্দে আফ্রিকা।

রক্তমেঘের ভাঁজে ভাঁজে লেগে আছে
আমাদের চুম্বন, আমাদের প্রেম।
দেখো হাড্ডিসার ওই পাথুরে মাটি
আজ পয়মন্ত।
খুদে পিঁপড়েও আজ শিখে গেছে এই দেশে
বুকে বয়ে নিয়ে যেতে উচ্চাশা।
ছেঁড়া হাত আর শূন্য জঠর থেকে
রোদ্দুরে ডানা মেলে আজ সেই গান—
ভ্রূক্ষেপহীন অবিনশ্বর গান
ন কোসি সিকেন্দে আফ্রিকা।

কবিতা ঃ বেঞ্জামিন মোলায়েজ
১৯৮৫ অনুবাদ ঃ অমিতাভ দাশগুপ্ত
গীতিরূপান্তর ও সুর ঃ প্র. মু.

৪১.

ছোট ছোট দুটো পা ছোট দুই হাত
দু'টাকায় খেটে খায় ভোর থেকে রাত।
দু'টাকায় খেটে খায় ভোর থেকে রাত
ছোট ছোট দুটো পা ছোট দুই হাত।

গালি খায় লাথি খায় ক'রে মাথা হেঁট
তার দিকে চেয়ে রয় কত খালি পেট।
তাই মুখ বুজে খেটে যায় ভোর থেকে রাত
ছোট ছোট দুটো পা ছোট দুই হাত।

কুড়তাকতাক দাদা কুড়তাকতাক
এক নয় দুই নয় দু'শ দশ লাখ।
দু'শ দশ লাখ শিশু করে প্রাণপাত
ছোট ছোট দুটো পা ছোট দুই হাত

শিশুমেলা শিশুদিন শিশু-বৎসর
কত মধুমাখা বুলি, ছাপা অক্ষর।
আলোঝলমল সভা ভাবের জোয়ার
তবু ভবিষ্যতেরা খাটে ভূতের বেগার।

এ মহাভারত দাদা এ মহাভারত
মাছের মতোই আছে শিশুর আড়ত।
জ্বালানীর মতো আছে শিশুর যোগান—
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ ছড়া ঃ অসীম মণ্ডল
পরিবর্ধিত রূপ ও সুর ঃ প্র. মু.

কাচের বাসনের ঝনঝন শব্দে
ভেঙে যাচ্ছে সময়।
দুঃখের রোদে কিংবা সুখের আমেজে
সিগারেটে শেষ টান দিতে দিতে
পুড়ে যাচ্ছে সময়।
ছেঁড়া গেঞ্জি, ফেলে দেওয়া একপাটি জুতো
রঙ জ্বলা নাইলনের মশারি
দেওয়ালের কোণে ঝুল
দেখে শুনে
বিষণ্ন পায়ে চলে যাচ্ছে সময়।
এই সব ভেঙে যাওয়া,
পুড়ে যাওয়া চলে যাওয়া সময়ের ভারে
নিজস্ব সুখদুঃখে
চাপা পড়ে যেতে যেতে
নিজের ভিতরে শুনি
নিজের কণ্ঠস্বর—
'ওঠো হে, দরজা জানলা খুলে
সময়ের ঝুঁটিটা এই বেলা
শক্ত মুঠোয় ধরো।'

১৯৮৬

কবিতা ঃ আলপনা ঘোষ
সুর ঃ প্র. মু.

৪৩.

সেই ছোট্ট দুটি পা
ঘুরছে দুনিয়া
শান্ত দুটি চোখে
স্বপ্নের দূরবীন—

কাছে যেই আসি
মুখে ফোটে হাসি
তবু কোথায় যেন বাজে
করুণ ভায়োলিন।

সেই ছোট্ট ভবঘুরে
আজও আছে মন জুড়ে
মন জুড়ে তার ছবি
আজও অমলিন—

ভালোবাসা নাও
ভালোবাসা নাও
আমি তোমায় ভালবাসি
চার্লস চ্যাপলিন।

ইচ্ছে করে আজ
ফেলে সব কাজ
তোমার পাশে পাশে
ঘুরে বেড়াই

মুখে নিয়ে হাসি
প্রাণের স্রোতে ভাসি
একসাথে একসুরে
প্রেমের গান গাই।

প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম

প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম
প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম
Love Love Love Love Love Love Love Love Love
Love Love Love Love Love Love Love Love Love
প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম
প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম

দুর্বার স্বপ্ন দুর্মর আশা প্রেম প্রেম প্রেম
রুদ্ধ কণ্ঠে ফুটে ওঠে ভাষা প্রেম প্রেম প্রেম
শত্রুর মুখে ছোঁড়ে বেপরোয়া বিদ্রূপ প্রেম প্রেম প্রেম
আবার মোমের আলোর মতো স্নিগ্ধ অপরূপ প্রেম প্রেম প্রেম

ভালোবাসা নাও চার্লস চ্যাপলিন
ভালোবাসা ছড়াও চার্লস চ্যাপলিন।
পৃথিবীর বুকে উষর মরুতে ফুল ফোটাও
চার্লস চ্যাপলিন—
ভালোবাসা ছড়াও চার্লস চ্যাপলিন।

পৃথিবীর বুকে উষর মরুতে ফুল ফোটাও...

কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

৪৪.

চলো হে চলো হে লড়াইয়ের দিকে যাই
চলো হে চলো হে, লড়াইয়ের দিকে যাই

লড়াই নাকি এখানেই শেষ!
বদলা নেওয়ার এখানেই শেষ!

কার কাছ থেকে শুনলে হে লড়াই নাকি এখানেই শেষ?
কার কাছ থেকে শুনলে হে বদলা নেওয়ার এখানেই শেষ?

কার কাছ থেকে শুনলে হে এই তাজ্জব কথা
বদলা নেওয়ার এত সহজেই শেষ?

চলো হে চলো হে লড়াইয়ের দিকে যাই
চলো হে, চলো হে, লড়াইয়ের দিকে যাই।

মূল ঃ অজ্ঞাত
২৬ আগস্ট ১৯৮৬ অনুবাদ ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গীতিরূপ ও সুর ঃ প্র. মু.

যতোই হোক ধুলোয় আবিল গা
অন্ধকার দুয়ারে দেয় হানা
তবু মানুষ তবুও মানুষ যায়
স্বপ্নে ; তার চলন থামেনা।

ফুরোয় না তার দিঘির স্নান।
দিঘি থাকেই কোথাও,
রোদে ঝলমল নদী থাকেই কোথাও
পাখপাখালির ভোরে মানুষ জাগে
শিশুর কাছে আসে ভালোবাসায়
প্রিয়ার কাছে মেলে বুকের গোপন কুসুম
মায়ের পায়ের তলায় রাখে মাথা
যা মানুষের বুক জুড়ানো শান্তি।

দুনিয়া তাই নোংরা হয়না
মানুষ তাই নোংরা হয়না
দুনিয়া তাই নোংরা হয়না
মানুষ তাই নোংরা হয়না।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬

কবিতা ঃ সাগর চক্রবর্তী
রূপান্তর ও সুর ঃ প্র. মু.

৪৬.

তোমার আছে বন্দুক
আর
আমার আছে ক্ষুধা।
তোমার আছে বন্দুক
কারণ
আমার আছে ক্ষুধা
তোমার আছে বন্দুক
তাই
আমার আছে ক্ষুধা।

থাকুক তোমার বন্দুক
থাকুক তোমার বুলেট
হাজার বুলেট
হোক না সে আরো একহাজার
তুমি সব খরচ করে ফেলতে পারো
আমার বেচারা শরীরে
তুমি আমাকে খুন করতে পারো
একবার দুবার তিনবার
ছ'হাজার বার সাত হাজার বার

তবু শেষটায়
(জেনো শেষটায়)
আমার কিন্তু চিরকাল থাকবে
তোমার চেয়ে বেশি হাতিয়ার
যদি তোমার থাকে বন্দুক
আর আমার কেবল ক্ষুধা।

কবিতা ঃ অতো রেনে কাস্তিইয়োর
জানুয়ারি ১৯৮৭ অনুবাদ ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতিরূপ ও সুর ঃ প্র. মু.

তুই ছেঁড়া মাটির বুকে আছিস
পুরোনো নাম, ঘুরেফিরে একই নাম ঃ
ভালোবাসা।
তুই খরা পাথর গলিয়ে দিস
কখনো সুখে কখনো শোকে, ভালোবাসা।

শিকড় আর শিরার বিষ তুলতে গিয়ে
তোর মুখ যে বিষে নীল
ও আমার নীলপদ্ম ভালোবাসা,
তার ঝলক পড়ে ঘরদুয়োরে
ভাঙা আলে তারই ঝিলিমিল
ও আমার নীলপদ্ম ভালোবাসা।

১৯৮৭

কবিতা ঃ অরুণ মিত্র
সুর ঃ প্র. মু.

একটি বালক
একটি বালিকা

বালকটির একটি কুকুর আছে
বালিকাটির একটি বিড়াল আছে
কুকুরটির গায়ের রং কী?
বিড়ালটির গায়ের রং কী ?
বালক বালিকা একটি বল লইয়া খেলা করিতেছে
বালক বালিকা একটি বল লইয়া খেলা করিতেছে
বলটি কোথায় গড়াইয়া যাইতেছে ?
বলটি কোথায় গড়াইয়া যাইতেছে ?

কোথায় ?
কোথায় ?

বালকটিকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইল ?
বালিকাটিকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইল ?

কোথায় ?
কোথায়
পড়ো, অনুবাদ করো
সব ভাষায়
স্তব্ধতায়

তোমরা নিজেরা কোথায় সমাধিস্থ আছো ?
তোমরা নিজেরা কোথায় সমাধিস্থ আছো ?
কোথায় ?
কোথায় ?

মূল কবিতা ঃ মিরোস্লাভ হোলুব
১৯৮৭ অনুবাদ ঃ মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
গীতিরূপ ও সুর ঃ প্র. মু.

৪৯

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা।

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাকে।*

এপ্রিল, ১৯৮৯

কবিতা ঃ শঙ্খ ঘোষ
সুর ঃ প্র. মু.

* গানে, শেষ তিন স্তবক বাদ দেয়া হয়েছে।

কেন এমন ভাগ্যি হলো
সরষের তেল মাগ্‌গি হলো
কেউ জানে না মাখনের কী খবর।
সরষের তেল নাকে দিয়ে
রাজা ঘুমোন নাক ডাকিয়ে
পায়ের তলায় মাখন মাখায় নফর।

টুইডেলডাম রাজা, তোমায়
ছি ছি ছি।
এখন থেকে রাজা হবেন
টুইডেলডী।
কেন এমন ভাগ্যি হলো
শাক শবজি মাগ্‌গি হলো
কেউ দেখেনি মাছের এত দর।
সব চলে যায় রাজার পাতে
এঁটো কুড়োয় হাড় হাভাতে
কেউ জানে না কী আছে এর পর।

টুইডেলডী রাজা, আরে
রাম রাম রাম!
এখন আবার রাজা হবেন
টুইডেলডাম।

ছড়া ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়
১৯৮৯ সুর ঃ প্র. মু.

৫১.

গিয়েছিলাম পাখির হাটে কিনেছিলাম পাখি
বঁধু তোমার জন্যে তোমারই জন্যে।

গিয়েছিলাম ফুলের হাটে কিনেছিলাম ফুল —
বঁধু তোমার জন্যে তোমারই জন্যে

গিয়েছিলাম লোহার হাটে কিনেছিলাম শিকল
ভারী শিকল, বঁধু তোমারই জন্যে
শেষে বাঁদীর হাটে গিয়েছিলাম
খুঁজেছিলাম তোমায়, পাইনি খুঁজে তোমায়,
বাঁদীর হাটে আমি খুঁজে খুঁজে হন্যে
তোমারই জন্যে

কবিতা ঃ জাক প্রেভের
অনুবাদ ঃ বাদল সরকার
১৯৯১ গীতিরূপান্তর ও সুর ঃ প্র. মু.

মা সেলাই করে, ছেলে লড়াই করে
মা সেলাই করে, ছেলে লড়াই করে, আর কি হবে?
এই তো হবার কথা, মা ভাবে...
আর বাবা, বাবা কি করে?
বাবা ব্যবসা করে—
বাবা ব্যবসা করে, তার বৌ সেলাই করে, তার ছেলে লড়াই করে—
আর কি হবে?
এই তো হবার কথা, বাবা ভাবে...
আর ছেলে, ছেলে কি ভাবে?
কিছুই ভাবে না সেই ছেলে, কিছুই ভাবে না সেই ছেলে।
তার মা সেলাই করে, তার বাবা ব্যবসা করে
আর সে লড়াই করে।
লড়াই যেদিন শেষ হবে
সেও ব্যবসা করবে তার বাবার সাথে...
মা চলে, সেলাই করে চলে
বাবা চলে, ব্যবসা করে চলে
ছেলে চলে, লড়াই করে চলে
একদিন ছেলে মরে যায়, চলে না, চলে না আর।
মা যায়, বাবা যায়, ফুল হাতে ছেলের গোরস্তানে...

জীবন আর সেলাই আর লড়াই আর ব্যবসা
জীবন আর সেলাই আর সেলাই আর ব্যবসা
ব্যবসা আর ব্যবসা আর ব্যবসা আর ব্যবসা
জীবন আর তার গোরস্তান।

কবিতা : জাক প্রেভের
১৯৯১ অনুবাদ : বাদল সরকার
গীতিরূপ ও সুর : প্র. মু.

৫৩.

ভালোবাসার মানুষ
ভালোবাসার মানুষ
যখন তুমি রাস্তা হাঁটো
সারা দিনের ক্লান্তি তোমার মুখের আবির
ভালোবাসার মানুষ

শোনো, ছুটির ঘন্টা বাজছে
এখন ঘরে ফেরার সময়
তাই কী? বলে চাঁদ কপালে আকাশ।
বলে তোমার শেষের গানটি এবার করো শুরু
'আমায় যাবার বেলা পিছু ডাকে...
দুচোখে ঘুম তোমার, তোমার শরীরে ঘুম
কোথায় তোমার ঘরে ফেরার ঠিকানা
সব ভুল হয়ে যায়

কবিতা ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর ঃ প্র. মু.

আগষ্ট ১৯৯২

৫৪.

আমি হাওয়া থেকে রস টানছি, হাওয়া থেকে।
মাটি নেই জল নেই বুক নেই মুখ নেই, না নেই।
এ কেমন ছোঁয়া একদিন আমি দেখাব, দেখাবই
পৃথিবীটা আমি ঘুরিয়ে নেব
ওই আধখানা ফালির ওপর তুমি,
ভোঁ বাজার সময়কার শিশির
ঝাঁ ঝাঁ বারোটা-একটার শ্যাওলা
ভরসন্ধের মাঠে বৃষ্টি পড়ছে আর হাওয়া
হাওয়া এই হাওয়া!

অক্টোবর ১৯৯২

কবিতা ঃ অরুণ মিত্র
সুর ঃ প্র. মু.

৫৫.

দিন আসছে, বাছা আমার, ঘোড়ার খুরে খুরে
খবর দেবে, কেন গেলাম গান বন্ধ ক'রে
বই হ'ল না সারা, কেন কাজ রইল পড়ে
কেন আমরা নিলাম শয্যা মাটির কোল জুড়ে।

মাণিক আমার সোনা আমার জল এনোনা চোখে
কেন যে চুনকালির জালে বোনা মিথ্যে কথা
কেঁদে কেঁদে হলাম সারা, পেলাম কেন ব্যথা
দিন আসছে, খবর নিয়ে সব জানবে লোকে।

সোনা আমার হেসে উঠবে ধুলোর ধরণী
মলিন শয্যা ঢেকে যাবে সবুজ ঘাসে ঘাসে
খুন বন্ধ, সুখের শুধু অফুরন্ত খনি
দুনিয়া জুড়ে শান্তি, সবাই হাত মেলাতে আসে।

তোমার জন্যে রেখে গেলাম সোনা মাণিক আমার
বিশ্বাস আর ভালোবাসা, আনন্দ বুক ভরা
মানুষের যে মূল্যটুকু, তার বদলে তোরা
হাত লাগিয়ে গড়িস শুধু তাদের একটি মিনার।

কবিতা ঃ এথেল রোজেনবার্গ
অনুবাদ ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুর ঃ প্র. মু.

ডিসেম্বর, ১৯৯২

৫৬

আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই
আমি আমীর 'আমি'কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর
আমি এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর।
বাংলা আমার জীবনানন্দ বাংলা প্রাণের সুখ
আমি একবার দেখি বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।

আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই
আমি বাংলায় ভাসি বাংলায় হাসি বাংলায় জেগে রই
আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় হাহাকার
আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চীৎকার
বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীরধনুক
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।

আমি বাংলায় ভালবাসি আমি বাংলাকে ভালবাসি
আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি
আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়
মেশে তেরো নদী সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়
বাংলা আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।

১৪ এপ্রিল, ১৯৯৩ কথা ও সুর ঃ প্র. মু.

মসজিদ মন্দির ভাঙবি কি ?
মসজিদ মন্দির না ভেঙে আয় ভাঙি,
আয় ভাঙি, আয় ভাঙি,
মিলেমিশে ভালবেসে ছিলাম এতকাল
তুলল কারা মধ্যিখানে নফরতের দেয়াল
ধর হাতুড়ি শাবল
চল সবাই মিলে চল
ঘা মেরে ওই ঠুনকো দেয়াল ভাঙি
আয় ভাঙি, আয় ভাঙি
ঘা মেরে বিদ্বেষের দেয়াল ভাঙি
আয় ভাঙি, আয় ভাঙি

মসনদের চারপাশে ওড়ে ধর্মের নিশান
বিধান ফরমান দিচ্ছেন যত জ্যান্ত ভগবান
হায় শুনে তাদের বুলি
হায় চোখে পরলাম ঠুলি
হায় তাদের কথা শুনে
এ হাত ভিজল ভাইয়ের খুনে
সেই হাতে আয় তাদের চোয়াল ভাঙি
আয় ভাঙি আয় ভাঙি

মসজিদ মন্দির গড়বি কি ?
মজজিদ মন্দির না গড়ে আয় গড়ি
আয় গড়ি আয় গড়ি

যারা বিলিয়ে দিল প্রাণ রাখতে মানুষের জানমান
যাদের নারা সবসে প্যারা সবসে উঁচা ইনসান
তারা ঠাঁই নিল এই দিলে
আজ আয়রে সবাই মিলে
চোখের জলে তাদের স্মরণ করি
সাচ্চা ভালোবাসার মিনার গড়ি।

৪-৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ কথা ও সুর : প্র. মু.

বর্ণানুক্রমিক সূচী

আমরা ধান কাটার গান গাই ১৭
আমার মাগো, তোর চোখে কেন ৩৫
আমাদের যেতে হবে ৩৪
আমি এত বয়সে গাছকে বলছি ৫৯
আমি বাংলায় গান গাই ৭৯
আমি হাওয়া থেকে রস টানছি ৭৭
আলু বেচো ছোলা বেচো ৪৫
আঁসুর মাঝে হাসির ঝিলিক ৩১
এই তপ্ত অশ্রু দিক শক্তি ২৩
এই তো জানু পেতে ৭২
একটি বালক, একটি বালিকা ৭১
কাঁচের বাসনের ঝনঝন শব্দে ৬৪
কিবা আসে যায় আশ্বিনে ৫৬
কিসের ভয় সাহসী মন ১৯
কী আমাদের জাত ৩২
কুটুস কট্টাস মট্টর ভাজা ৫০
কেন এমন ভাগ্যি হোল ৭৩
খাদে ঠকি কলে ঠকি ৫৫
গিয়েছিলাম পাখীর হাটে ৭৪
ঘৃণায় তো চিরদিন মুখ হয় বিকৃত ৪৯
চলো হে চলো হে ৬৭
চেরাবাণ্ডারাজু—ঢেউয়ে ঢেউয়ে ৩৯
চেয়ে দেখো আজ ২০
ছোট ছোট দুটো পা ৬৩
জন্মিলে মরিতে হবে রে ২১
জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি ১৮
ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরা ৫৭

ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে ৪২
তুই ছেঁড়া মাটির বুকে ৭০
তোমার আছে বন্দুক ৬৯
তোর কি কোনো তুলনা হয় ? ৫৩
দারুন গভীর থেকে ৪৬
দিন আসছে বাছা আমার ৭৮
ন কোসি সিকেলে আফ্রিকা ৬২
ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায় ৫২
পাথরে পাথরে নাচে আগুন ৫৮
পিঁপড়েকে বলে পিঁপড়েনী ৪১
বলো সাথী, সবদিনই ৪৩
ভয় পাস নে ছেলে ৩৮
ভালোবাসার মানুষ ৭৬
ভিন্‌দেশী এক পাগল মরে ৪৭
মস্‌জিদ মন্দির ভাঙবি কি ? ৮০
মা সেলাই করে ৭৫
মাগো আমার মরতে এখন ৩০
মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি ২২
যতোই হোক ধুলোয় আবিল গা ৬৮
যুদ্ধকে মুছে ফেলতে চাই ৩৬
লড়াই কর লড়াই কর ২৯
লক্ষীন্দর জিয়াইবার আশে ৬১
লাল কমলা হল্‌দে সবুজ ৫১
লাল রং দেখে কিছু লোক ৩৭
শুন শুন সর্বজন ২৪
সাপের মাথায় পা দিয়ে ৪৪
সুন্দরী লো সুন্দরী ৬০
সেই ছোট্ট দুটি পা ৬৫
স্লোগান দিতে গিয়েই ৪০
হে হে হে ছোকরা চাঁদ ৫৪

আনমনে গান মনে

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

একটা গান 'হয়ে উঠেছে' কিনা সেটা অনুভব করা যায়। সে গান একজন মানুষ বা অনেক মানুষকে কতখানি টানল, নাড়িয়ে দিল বা নিথর করে দিল, ভাবালো বা উচ্ছ্বসিত করল, জাগালো বা জুড়িয়ে দিল, তার একটা ধারণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। মানুষের মুখ দেখে, তার কথা শুনে, তার মধ্যে একটা বদল লক্ষ্য করে। কাউকে না ছুঁয়েও কোন গান 'হয়ে ওঠে' কিনা আমি জানিনা। কিন্তু একটা গান কি করে 'হয়ে ওঠে' তা যদি আমার মতো এক মানুষকে বলতে বা লিখতে বলা হয় তাহলেই হয় বিপদ। গানের 'হয়ে ওঠা' নিয়ে লিখতে গেলে সে লেখাটিরও ত 'হয়ে ওঠা' দরকার। লেখাটির হৃদয় আর বুদ্ধি—দু' এরই কাছে গ্রহণীয় হওয়া চাই। গান দিয়ে দুটিকেই ছোঁয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু লেখাতে সে সাহস করিনা। তার জন্যে প্রয়োজন গানের মত শিল্পমাধ্যমটির সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান। গানের তত্ত্ব ত বটেই, নন্দনতত্ত্বে অনায়াস সঞ্চার। সেই নন্দনতত্ত্বের আবার নানা নিরিখ বা দৃষ্টিকোণ। যিনি তা নিয়ে আলোচনা করবেন, তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণ অথবা তাঁর নিজের পছন্দ বা বহুজনস্বীকৃত দৃষ্টিকোণ ছাড়াও আসে আলোচনার পটভূমি—ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সংস্থানিক (topographical), নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক (ethnic), আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাযুক্তিক (technological), আরও কতো কি? বিভিন্ন পটভূমিতে অথবা একই সঙ্গে অনেক পটভূমিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পসৃষ্টির 'হয়ে ওঠার' বিভিন্ন ধাপের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়ে আসছে নিশ্চয়ই। আধার আর আধেয়ের, রূপ আর বিষয়বস্তুর শান্তিপূর্ণ বা অশান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথাও আসে। শিল্পসৃষ্টিকে ঘিরে কত চিন্তা, আন্দোলন, আবার রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনকে ঘিরে কতোরকমের শিল্পসৃষ্টি হয়ে আসছে কতকাল ধরে। এ আলোচনায় নামা মানে এক মহাসাগরে নামা। বিদগ্ধজনেরা এ সাগরে নামছেন দেখলে ইচ্ছে হয় ভাঙায় বসে দেখি। যতোই গাই, 'ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে', সাগরে নামার ক্ষমতা ত নেই। ডাঙায় বসে আমি আর কি করতে পারি। 'ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙায় ডিঙা চালায় ওরে সে কোন জন?'

বিজ্ঞানের, রাশিবিজ্ঞানের (statistics) ছাত্র ছিলাম। বুঝতে পারি, কতো কি যে জানার আছে। এক শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে আর এক শিল্পমাধ্যমের আন্তঃ-সম্পর্ক, পরস্পরনির্ভরতা, প্রবহমান জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ, শিল্পীর শ্রেণী-গত অবস্থান ও শ্রেণী-মানসিকতার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক, আরও কত কি ?

একটি শিল্পসৃষ্টির হয়ে ওঠার পেছনে কাজ করে কত জটিল প্রক্রিয়া, ঠিক একটি ফুল ফোটার বা এক শিশুর জন্মের মতো। সেই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে হস্তক্ষেপ (intervention) এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন হয়ে উঠত তেমন না হয়ে অন্যরকম হয়ে উঠতে সাহায্য বা বাধ্য করতে পারে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই হস্তক্ষেপ ত শুধু হস্তক্ষেপ নয়, অবশ্যই চিন্তাক্ষেপ—নিজের এতদিনের হয়ে ওঠা মানসিকতা, মনন, বোধি বা বিশ্বাসের প্রক্ষেপণ। মানুষের শিল্পসৃষ্টি ত শুধুই প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়—এখানে হস্তক্ষেপের বা মনঃক্ষেপের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ত মানুষের হস্তক্ষেপ হচ্ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে, তা ভালোর জন্য হোক, আর মন্দের জন্যেই হোক। অথবা ভালো ভেবে করা হচ্ছে, আসলে মন্দ হচ্ছে। এও ত আর এক বিতর্ক।

বুঝতে পারছি, এ সব এবং আরও অনেক কিছু জানা দরকার। আর কবুল করতে বাধা নেই, এসব আমার সেভাবে জানা নেই। তবে এটা ঠিক, গানের কারিগর হিসেবে যখন কাজ করেছি, তখন এ সব ক্রিয়াকাণ্ড ত আমার কাজের মধ্যে আমার মাধ্যমেই হয়েছে। তা নিশ্চয়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়নি। হস্তক্ষেপ বা মনঃক্ষেপ ত আমিও করেছি। সব ব্যাপারটাই যে না বুঝে করেছি তাও নয়। তবে সবটা আমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। আসলে এক একটি প্রক্রিয়াও ত কতগুলি ক্ষুদ্রতর এককের সমষ্টি। তাকে কি বলা যায় ? অণু-প্রক্রিয়া (Sub-process বা micro-process) ? প্রক্রিয়াগুলি ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন প্রণালী (method)। সেই প্রণালীও ত আবার কতগুলি অণুপ্রণালীর সমাহার। ব্যাপারটা বুঝতে গেলে বা বোঝাতে গেলে এই সব প্রক্রিয়ার অণু-প্রক্রিয়ার, প্রণালীর—অণুপ্রণালীর নামের (terminology) প্রয়োজন হয়। হয়ত আমি তাদের মধ্য দিয়েই গেছি। কিন্তু নাম বলতে পারিনা। নাম আছে কিনা তাও জানিনা। শহরে রাস্তা, গলির নাম থাকে। গ্রামে আল ধরে হাঁটলে সেই রাস্তার ত নাম নেই। বড়জোর পাড়ার নাম জানা যায়। এ বেশ মজার ব্যাপার। বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে গেছি। কোন কোন রাস্তা আর গলি দিয়ে হেঁটেছি, বলতে পারছি না। বন্ধু হয়ত একটু হাসছে। কিন্তু আমার আসল

কাজ ত রাস্তার নাম জানা নয়, পেঁাছে যাওয়া। পেঁাছে ত গেছি তার বাড়ি। কিন্তু তার মানে এই নয়, রাস্তার নাম জানার দরকার নেই। না জানলে ত আর একজনকে পথনির্দেশ দেওয়া মুশকিল। আমি আমার এই অসম্পূর্ণতার কথা জানি। অথবা বলা যায়, আমি জানি যে আমি জানিনা। গান নিয়ে কয়েকবার যা লিখেছি বা বলেছি, বন্ধুদের অনুরোধে। এবারও যে সাদা কাগজ কালো করছি—ব্যাপারটা তেমন ভালো নয় জেনেও, তাও নিতান্তই বন্ধু পার্থের অনুরোধে। সঙ্কোচ অনুভব করছি খুবই। 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' গেয়েও সঙ্কোচ কাটছে না। নিঃসঙ্কোচে কথা বলি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময়। কিছু একটা বলার ফাঁকে ফাঁকে আমি বন্ধুদের কথা শুনি। তাঁদের জ্ঞানের পরিধি আর গভীরতা আমার থেকে অনেক অনেক বেশি। অল্প সময়ের মধ্যে মনের জগৎটাকে প্রায় বিনা আয়াসে অনেকখানি বাড়িয়ে নিতে আড্ডার জুড়ি নেই। সঙ্কোচ কাটাতে তাই আড্ডায় যেভাবে কথা বলি, অনেকটা সেভাবেই কথা বলছি, অথবা কথা লিখছি অথবা লিখে বলছি। কিন্তু এখানে ত বন্ধুরা কেউ নেই। এ এক নিঃসঙ্গ আলাপচারি—নিয়মহারা হিসাবহীন।

'শুনি কড়ি নাইকো যার, তুমি তারে কর পার।
আমি দীনভিখারী নাইকো কড়ি দেখো ঝুলি ঝেড়ে।
হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার করো আমারে।'

যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন নাকি এ গান গাইতাম খুব দরদ দিয়ে, মার মুখে শনেছি। এখন জীবনসায়াহ্নে—জীবনসায়াহ্নে বলতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার গানের অনুরাগী একজন প্রবন্ধকার এক দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকের প্রতি পত্রে লেখেন—প্রতুল মুখোপাধ্যায় জীবনসায়াহ্নে স্বীকৃতি পাচ্ছেন। পড়ে মনটা দমে গেল। সেকিরে? সায়াহ্ন এসে গেল। দু এক-জনকে বলেও ফেললাম—'হ্যাঁরে, বাহান্ন কি সায়াহ্ন?' জীবনরাত্রি হয় কোন বয়সে? পরে বই খুলে দেখলাম, ভারতে expectation of life হচ্ছে বাষট্টি। তাহলে ত যাহা বাহান্ন তাহা সায়াহ্ন। বোধহয় সায়াহ্নের থেকেও একটু এগিয়ে। যাই হোক, ভাবতেও ভাল লাগে, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'ল, আমার 'হরি' মানে আপনারা আর ব্যাপ্ত মানুষ আমাকে পার করে দিচ্ছেন। আমার প্রতি মানুষের একটু পক্ষপাত ত হবেই। আমার 'কড়ি' মানে প্রথাগত শিক্ষা ত কিছুই নেই। দীন ভিখারীর মতোই আমার অবস্থা।

বলবার মতো আমার কিছু নেই। এই দীন ভিখারীর ঝোলায় চাল ডাল আলু সব এক দোকান থেকে কেনা নয়। এক বাড়ি থেকে পাওয়া নয়। মিশিয়ে দিলে কোন চালটা কোন বাড়ির, ভিখারী কি বলতে পারে? আমিও বলতে পারিনা সবসময়। মাঝে মাঝে পারি। বলতে পারি আজকের খিচুড়ির আলুগুলো অমুকবাবুর বাড়ি থেকে পেয়েছি। অমুকবাবু আবার কোথা থেকে কিনেছেন, তা বলতে পারিনা অবশ্য।

দারুণ আনন্দ হয়, খিচুড়িটা যখন উতরে যায়—কেউ যদি বলে, 'আর একটু দাও ত। আমাদের বাড়িতে একেবারে হাই কোয়ালিটি জিনিস ছাড়া কিছু ঢোকেই না। কিন্তু খেতে এমন হয় না।' নীতিকথার শেষে উপদেশের মতো বলা যায় 'উচ্চমানের চাল, উচ্চমানের ডাল আর উচ্চমানের অন্য উপকরণ থাকিলেই উচ্চমানের খিচুড়ি হইবে, এমন কথা নাই। এখানে রন্ধনকর্তা বা পাচকের এবং পরিবেশকের মুখ্য ভূমিকা আছে। পাচক নিজেই যদি পরিবেশক হয় (যেমন আমি এবং এখনকার গায়কদের অনেকেই) তাহা হইলে তাহার দায়িত্ব অপরিসীম।'

আমার চাল ডাল কেমন তা ঠিক জানি না। ভিক্ষা করাই বলুন বা আত্মস্থ করাই বলুন আমি কোনখান থেকে কতটা নিতে পারব সেটাও ত আমার ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে। কিছুই আত্মস্থ করিনি তা বলব না। বরং আমার কিছু কাজ শুনে কোন সঙ্গীতজ্ঞ বলেছেন—

'কার কাছে শিখেছেন, এ জিনিস ত সাধনা ছাড়া হয় না।' তাঁদের কথাকে অসম্মান করছি না। তাঁরা আমার গানে কিছু খুঁজে পেয়েছেন বলেই না বলেছেন এই কথা। এ সব কথা শুনে আনন্দ নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু আমি এ সব কথায় প্রভাবিত হই না বা নিজেকে প্রভাবিত হতে দিই না। কারণ আমি খুব ভালোভাবেই জানি, সঙ্গীতে শিক্ষিত মানুষদের শিক্ষা এবং সাধনায় আয়ত্ত করা দুরূহ কাজ আমার পক্ষে বিনা শিক্ষায় বিনা সাধনায় আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। আমার যেটুকু ক্ষমতা বা ধারণশক্তি, আমি সেটুকুই নিতে পারি। সেটুকুই আমার গান বানানোর (বা সেই খিচুড়ি রান্নার, যাই বলুন) কাজে লাগে। আরও অনেক কিছু আয়ত্ত করতে পারলে সে কেমন হোত জানিনা —হয়ত আরও ভাল হোত। না হতেও পারত। কেউ হয়ত বলতেন—এতে অনেক ভালো জিনিস পড়েছে বুঝতে পারছি। ঘিটাও ভাল। ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। কিন্তু জানো, এখানে চাল-ডালের যে স্বাভাবিক গন্ধটা ছিল, সেটা চাপা গেল। এর আগের দিন যে খিচুড়িটা খেয়েছিলাম তোমার হাতের

—এটা তেমন নয়। আহা সে খিচুড়ির স্বাদ মুখে লেগে আছে।' তৃপ্তি আদায় করা কাজটা মোটেই সহজ নয়।

এর মানে নিশ্চয়ই এ নয় যে দুরূহ ও গভীর ও দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ উপকরণে কোন সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয় না। সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য শিক্ষা ও সাধনার গুরুত্বের কথা কে অস্বীকার করবে? তবে দেখতে হবে কি সৃষ্টি হচ্ছে। স্বর্ণহীরকমণিমাণিক্যখচিত শিল্পসৃষ্টিতে একটা দেখানো ভাব থাকে —কত দাম জানো? ভাবতে পারো? আর কোথাও পাবে?—এমন একটা ভাব থাকে। অনেকেই হয়ত এটি শিল্প হিসেবে কেমন হোলো, সে বিতর্ক সরিয়ে রেখে মণিমাণিক্যের দামের হিসেব করতে থাকেন। এটা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়। কিন্তু মাউণ্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দিরের মর্মরভাস্কর্য দেখলে বোঝা যায় শিক্ষা ও সাধনা কোন স্তরে গেলে এমন সৃষ্টি সম্ভব। এখানে বাইরের আড়ম্বর একেবারেই নেই। কিন্তু দেখলে চোখ ফেরানো দুঃসাধ্য। পাথরে এমন fluidity আনা যায়? দেখে ত মনে হয়, মোমেও এ কাজ করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা করিনি, বুঝিনা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কেন, কোন সঙ্গীতই যে বুঝি বা বোঝাতে পারি তাও নয়। কিন্তু ভালো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যাই হোক, যার প্রাথমিক জ্ঞান নেই এমন মানুষকেও যে প্রভাবিত করতে সমর্থ এটা তো আমি নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারি। রস আস্বাদনে তৃপ্ত হতে গেলে যে তাকে সমঝদার হতেই হবে, তা নয়। তবে সমঝদার ত বুঝতে পারেন কোথায় কি কাণ্ড করা হয়েছে—একটা বাড়তি তৃপ্তি পান। সেটা আর আমি পাবো কেমন করে? কিন্তু সে সঙ্গীতের অনুরণন আমার মতো অপ্রশিক্ষিত কানে যেভাবে হচ্ছে তার কোনো দাম নেই? অবশ্যই আছে। আড্ডার মেজাজে কথা বললে এরকমই হয়—নিজের কথা বলতে গিয়ে শিল্পের উপকরণ, উপকরণের মান উন্নয়ন, উপকরণের মান উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পের উপভোক্তার (দর্শক, শ্রোতা ইত্যাদি) রুচির সম্পর্ক এ সব কথা এল। তারপর শিল্পের সমঝদারির (appreciation) কথাও ঢুকে পড়ল। এ সব সামলানো কি আমার কাজ? এতক্ষণ গুনগুন করলে হয়ত একটা সুর এসে যেত গলায়। সেটাই ভালো ছিল। এখন আর ওসব ভেবে কি হবে? আগের চিন্তাগুলো একটু গুছিয়ে নিই।

উপকরণ ভালো হলেই চলেনা, চাই ঠিক অনুপাতে উপকরণের মিশেল। নতুন কথা কিছু নয়। এভাবেও বলা যেতে পারে—শিল্পের মান বা quality নির্ভর করে মান বা measure এর উপর। গানের ক্ষেত্রে বলা যায় এরকম—গানে কোন

সুর কতটুকু প্রয়োগ করা হবে? কোন বিশেষ expression কতখানি ফুটে উঠবে, কোন বিশেষ বাজনা কতখানি বাজবে, কত volume-এ বাজবে? Body movement এর প্রয়োজন আছে কিনা? থাকলে কতখানি করা হবে? কথার দাবি অনুযায়ী গলার হেরফের (voice inflexion) করা হবে কিনা? করলে কতখানি করা হবে? গলায় জোয়ারির কাজ দেখাবে কি? কতখানি? তানবিস্তারের জায়গা আছে? কতখানি? এই সবের মীমাংসা যিনি করতে পারেন তিনি একজন সত্যিকারের artist।

এই মীমাংসা ত এক এক করে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হবার নয়। এক প্রশ্নের উত্তর আর এক প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে জড়িত। ব্যাপারটা এরকম। গ কি দরকারী?—হ্যাঁ, যদি ক আর খ থাকে!—গ কতটা থাকবে?—দেখ, ক আর খ কি পরিমাণে আছে? তার উপর নির্ভর করবে।—খ কি দরকারী?—ক যদি এই পরিমাণে থাকে, তাহলে দরকার নেই। ক খুব কম থাকলে ভাবা যেত। ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে। ক কি দরকারী?—খুব দরকারী। কিন্তু ক তো নেই।—নেই? তাহলে আর খ দিয়ে কি হবে? ঠিক আছে, গ এত পরিমাণ আর ঘ এত পরিমাণ দিয়ে দেখ।

অথবা ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে। ক, খ কি দরকারী?—খুব দরকারী।—কিন্তু ক তো নেই।—নেই? খ আছে?—নেই।—তাও নেই? তাহলে ছেড়ে দাও। গ, ঘ আছে কিন্তু।—নাঃ, ক খ থাকলে, তবে গ আর ঘ নিয়ে ভাবা যেত। ছেড়েই দাও, হবে না! ইনি দায়সারা কাজ করতে চান না। বড়ো শিল্পীর লক্ষণ এর মধ্যে আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে—কি বলছ? ক ও নেই, খ ও নেই? গ, ঘ আছে? ঠিক আছে, গ আর ঘ নিয়েই দেখা যাক। গটা ত দেখছি বেশ ভালোই আছে, ঘ কে একটু ঘষে মেজে নিতে হবে। দেখা যাক। মনের মত না হলে মানুষকে না শোনালেই বা না দেখালেই হল। পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? এই শিল্পীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মেজাজ রয়েছে। এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভাবনার উৎস হচ্ছে দুটি বিশেষ উপকরণের অভাব। আমার খালি গলায় গান যা আজ মোটামুটি স্বীকৃতি পেয়েছে, তার পেছনেও ছিল একরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইচ্ছে যার উদ্ভব, আমাদের বাড়িতে কোন বাজনার অভাব থেকেই। আবার এমনও ত হতে পারে—ক, খ নিয়ে ত এতদিন কাজ করলাম। গ আর ঘ কে নিয়ে দেখা যাক না কি হয়? অথবা ক আর গ কে

নিয়ে। এ ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে কাজ করে নিজেকে নিজেই অনুকরণ করার, পৌনঃপুনিকতার গ্লানি থেকে মুক্তি—এক কথায় সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রয়াস। সুরে আমার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা তা অনেকটা এজাতের। ভাবনাটা এরকম। গানের ত মোটামুটি এরকম চলনই দেখি। অন্যরকম করে দেখা যাক না। নিজের লেখা গান 'চ্যাপলিন' এর কথায় সুরে যে নতুন ধরনের কাজ তা এই বৈচিত্র্যের খোঁজে। অবশ্য চ্যাপলিনকে গানে প্রতিষ্ঠা করতে আমার কাছে এ ছাড়া উপায় ছিল না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experimentation)—সেটা কোন উপকরণের অভাবের কারণেই হোক আর / অথবা বৈচিত্র্যের খোঁজেই হোক, শিল্পীর কাছ থেকে যা দাবি করে তা হল সাহস—একটা নতুন কিছু করার সাহস। নতুন রাস্তায় যাওয়ার সাহস। বাঁধা নিয়ম ভাঙার সাহস। নিজেকে ভাঙার সাহস। মনে আছে চ্যাপলিন গানে 'love love love love...'এর মতো 'প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম...' শুনে অনেকেই বলেছিলেন—প্রেম শব্দটা এখন ব্যবহৃত ব্যবহৃত হতে হতে তার দ্যোতনা খুইয়েছে। এই শব্দ এতবার ব্যবহার করবেন কিনা ভাবুন। একজন ত এমনও বললেন—দর্শক হেসে উঠতে পারে—এবং সে হাসি অবাঞ্ছিত হাসি। তাঁরা আমার যথেষ্ট হিতাকাংক্ষী এবং যথেষ্ট চিন্তাশীল। কিন্তু তাঁদের কথা না মানার সাহস অর্জন করতে হয়েছিল আমাকে। আমি ভেবেছিলাম কবিরা ত পুরোনো শব্দকে নতুনভাবে ব্যবহার করে তাকে নতুন করে তোলেন। শুদ্ধ করে তোলেন। দেখাই যাক না। আসলে প্রেম শব্দটির ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আমাকে টানছিল। প্রেম প্রেম প্রেম বললেই মনে হয় কোনও তারযন্ত্র বাজছে। আর তার সঙ্গে love love love বললে মনে হয় কোন wind instrument বাজছে। এ ব্যাপারটাই আমাকে ভীষণ উদ্‌বুদ্ধ করছিল। বাংলা গানের কথায় একটা বৈচিত্র্য ত আসবেই, তার সঙ্গে এ শব্দগুলি আমার গানে যন্ত্রের অভাব পূরণ করবে। এই যুক্তিতে ভর দিয়ে হিতোপদেশ না মেনে এগিয়ে যাবার সাহস পেয়েছিলাম। আজ চ্যাপলিন আমার জনপ্রিয়তম ও সার্থক গানগুলির একটি।

Experimentation বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি করি গানকে আমি আমার মতো করে যতটা বুঝেছি তার উপর ভিত্তি করে। যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁরা যখন ভাঙেন, তখন তাঁরা জানেন তাঁরা কোন বাঁধন খুলছেন, কোন বেড়া বা দেয়াল ভাঙছেন। আমি ত সেভাবে ভেবে ভাঙিনা। কোথাও বুঝতে পারি অবশ্য।

বুঝি আমি গানের চলন বদলে দিচ্ছি। সঙ্গীতজ্ঞরা কখনো কখনো আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমি কোন নিয়ম, কোন দেওয়াল ভেঙেছি, এবং বলেছেন কাজটা ভালো হয়েছে। কিন্তু সেটা ত গান হয়ে যাওয়ার পরে। আমার মনে হয়, না জেনে দেওয়াল ভাঙাটা একটু সোজা। নিয়ম-টিয়ম অনেক কিছু জেনে ফেললে এমন পারতাম কিনা কে জানে? সলিল চৌধুরী পেরেছেন। তাঁর সাঙ্গীতিক পটভূমি বিশাল। লোকসঙ্গীত শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য) তাঁর অবাধ সঞ্চার। তাঁর experimentation-এর জাতটাও নিশ্চয় আলাদা হবে। 'এই রোকো, পৃথিবীর গাড়িটা থামাও' আমার কাছে এক অনবদ্য experimental কাজ। শিল্পসৃষ্টি—তার মধ্যে experimentation থাকুক আর নাই থাকুক, সেটা করা হয় ত একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। কেউ এটিকে দেখবে শুনবে পড়বে অথবা সেই রান্নার অনুষঙ্গ নিয়ে বলা যায়—খাবে। খাওয়া কথাটা ত এখন বৈঠকী বা আড্ডার বাংলায় খুব চালু শব্দ। Public খাচ্ছে, Public খাচ্ছে না, এ সব কথাগুলি ত খুবই শোনা যায়। আর একটি সুন্দর কথা বলা যায়। চিত্তপ্রসাদ। কতো বড়ো এক শিল্পীর নাম এসে গেল। (এমনই ভাবে এক প্রিয় কবির নাম এসেছিল আমার একটি গানে শব্দ হিসেবে—বাংলা আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুখ)। চিত্তপ্রসাদের ছবির উদ্দেশ্য শুধু চিত্তপ্রসাদ ছিলনা। চিত্তপরিবর্তন। সে রূপান্তর কখনো বিষাদে কখনও বা ক্রোধে। কিন্তু চিত্তপ্রসাদ ছাড়া ত চিত্তপরিবর্তন সম্ভব নয়। শিল্পের প্রসাদগুণ না থাকলে মন-বদলের আশা করা বৃথা। এ চিত্ত যদি জনচিত্ত হয়—এ গান যদি গণসঙ্গীতও হয় তাহলে চিত্তপ্রসাদের উদ্দেশ্যটা থেকেই যায়। মনের প্রসাদ—মন বদল—তবে না দিন বদল। গণসঙ্গীতেও আমি তাই চিত্তপ্রসাদের ওপর জোর দিয়েছিলাম। আমি মানে আমি একা নই—অনেকেই দিয়েছিলেন। গানটা যদি গান হিসেবেও ভাল লাগে, তবে ত আমি গানের কথাকে আমার কথা মনে করব। তেতো ওষুধ কে খেতে চায়, একটা সুস্বাদু ফলে বা মায়ের হাতের রান্নায় যদি একই ফল পাওয়া যায়? খাদ্যের অনুষঙ্গটা আবার এসে গেল দেখছি। ভালই হ'ল। সেই উপকরণের কথা বলছিলাম না। ঠিক উপকরণের ঠিক ঠিক মিশেল, এ মিশেল কিন্তু অন্যরকমের। রান্নার সঙ্গে তুলনীয় এই অর্থে এই উপকরণগুলি একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়—এবং তৈরী করে একটা processed food—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়—যে উপকরণগুলি দিয়ে শুরু করা হয়েছিল, সেগুলি একে অন্যের উপস্থিতিতে এবং একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার (process) বা বিক্রিয়ার (reaction) মধ্যে দিয়ে গিয়ে তাদের ধর্ম

বদলায়। এক উপকরণের সঙ্গে আর এক উপকরণের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অন্য এক পদার্থের সৃষ্টি হয়। যেটা একটা যৌগিক পদার্থ বা compound। গানকে যৌগিক পদার্থ বলতেও যেন কেমন কেমন লাগছে। গান কি পদার্থ? গান তু আমার কাছে এক প্রাণবন্ত সত্তা—মনে হয় chemistry নয়, bio-chemistry-র কিংবা genetic engineering-এর অনুষঙ্গ আরও জুৎসই হোতো। সেই পড়াশোনা ত নেই আমার। তখন, ধরা যাক, কথা কেমন, সুর কেমন এসব আর আলাদা আলাদা করে মনে হয় না। কিন্তু সব মিলে একটা কিছু হয়ে ওঠে। আমার লেখা অনেক গান এরকম। সুর বাদ দিয়ে ছাপার অক্ষরে দেখতে আমারই অসুবিধে হয়। অন্যদের ত হবেই।

তারপর পরিবেশনের কথা আসে। শেষপর্যন্ত ত পরিবেশনের মধ্য দিয়েই শিল্প-সৃষ্টি আসে মানুষের কাছে। পরিবেশন বা presentation আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এটার অভাবে বা দোষে অনেক মহান শিল্পসৃষ্টি মানুষের কাছে গ্রহণীয় হতে চায় না। একটি কবিতার বই, তার বাজে মলাট। কবিতাগুলো সাজাবার মধ্যে কোন চিন্তার ছাপ নেই। বইয়ের মধ্যে পাতায় পাতায় ছাপার ভুল। অথচ কবিতাগুলি বেশ ভালো। পরিবেশনের অতিরিক্ত ত্রুটিতে শেষরক্ষা হল না। দেখা যাচ্ছে পরিবেশন ব্যাপারটা শুধু নাচ গান নাটকের মত performing art-এ নয়, সব শিল্পকলাতেই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য পরিবেশনেও দু দিকই ভাবতে হয়। এক খাবারগুলো কেমন করে দেওয়া হচ্ছে। কোনটার পর কি? দুই—যিনি দিচ্ছেন তার ব্যবহার। দেবার সময় কোনো কথা বলছেন কিনা। বললে কি বলছেন? তার মুখের ভাব কেমন? গানের পরিবেশনেও সেই এক কথা। গানের ক্রম বা sequence, কিভাবে গাওয়া হচ্ছে, দর্শকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বা communication কতোটা হচ্ছে? এগুলো ত আমার কাছে খুব জরুরী মনে হয়।

এখন যেমন catering service এ কেমন যান্ত্রিক নৈর্ব্যক্তিক সুশৃঙ্খল এবং সময় বাঁচানো (ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই) পরিবেশন দেখা যায়, গানেও মাঝে মাঝে সেরকম দেখি। একটি list দেখে পরপর গানগুলি গাওয়া হচ্ছে—দর্শককে বা শ্রোতা-কে না ছুঁয়েই। কখনও মনে হতে পারে, শিল্পীর ভাবখানা এমন যেন তিনি তাঁর পরিবেশনে শ্রোতাদের কৃতার্থ করে দিচ্ছেন। মুখের মধ্যে একটা আত্মগরিমার ভাব—(আত্মবিশ্বাসের হলে ঠিক আছে), শ্রোতাদের সঙ্গে দু একটা ভালো কথা—যেন প্রসাদ ছুঁড়ে দেবার মতো। শ্রোতারা শুনে বিগলিত বা করতালি

মুখরিত। এটাও আমাকে খুব টানেনা। আমি নিজে খুব সহজ সরল স্বাভাবিক পরিবেশনের পক্ষপাতী। তার একটা কারণ হয়ত এই, যে দেখাবার মতো আমার এই সাড়ে বাষট্টি ইঞ্চি চেহারা ছাড়া ত কিছুই নেই। বলবার মতো কিই বা আছে। কিছুই তেমন জানিনা। বিনীতভাবে শ্রোতাদের সামনে আসি। সারা দর্শককে অত্যন্ত আপন জনের মতো ভাববার চেষ্টা করি এবং অনেক সময় দেখতে পাই কখন আমি তাঁদের আপনজন হয়ে গেছি। পরিবেশনের তো কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কাকে কি মানায়, এবং কার কাছে কি পরিবেশন করা হচ্ছে সেটা খেয়াল রাখতে হয়। এখানেও ভেতরে ভেতবে থাকা দরকার একটা মাপের বোধ। এতটা, এর বেশি নয়। চোখধাঁধানো পরিবেশন একদিন দুদিন মানুষ সাদরে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারটা বেশিদিন নাও চলতে পারে। কে আর রোজ নামী দামী হোটেলে খেতে চায় বলুন। দু দিন খেলেই মনে হবে আমাদের সেই বাড়ির ডালভাত ভালো। আমার নিজের ত অনাড়ম্বর পরিবেশন ভালো লাগে। কিন্তু সবার রুচি ত সমান নয়। অনেক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গায়ক বা যন্ত্রশিল্পীরা কিরকম রাজপোশাক পরে মঞ্চে আসেন। আসেন ত নয়, আবির্ভূত হন। ওই গানবাজনার সঙ্গে ওরকম জেল্লাদার পোশাক খুব যায় বুঝি? কই ভীমসেন যোশী ত পরেন না? অবশ্য আমি সব শ্রোতাদের মনের খবর জানিনা।

আরও কথা আছে। ঘরোয়া প্রায় প্রসাধনহীন পরিবেশন যদি একবার গৃহীত হয়, তাহলে গ্রহীতারা দিন দিন নতুন অলঙ্করণ দাবি করবেন না। ব্যাপারটা মোটামুটি চিরন্তন হয়ে যায়। আমার বাড়ির সামনের গাছটার মতো! গাছের যে সাজবদল সেটা খুব স্বাভাবিক। কখনও ফুল ফুটছে, কখনও পাতা ঝরছে, কখনও নতুন পাতা গজাচ্ছে—কিন্তু আসল ব্যাপারটা একই আছে। কিন্তু গাছকে যখন মানুষ সাজায়—কেয়ারি করা পার্কে, তার স্বাভাবিক চেহারা বদলে বিশেষ এক ডিজাইনে—কোনটা গোল কোনটা এক জন্তুর মতো, আমার যে কি খারাপ লাগে, কি বলব? আর খারাপ লাগে ময়দানে প্রদর্শনীর সময় গাছের গায়ে যখন বিজলী বাতি লাগানো হয়। একে ত তাপে গাছগুলির কষ্ট হয়, ক্ষতি হয়। আর এর চেয়ে কদর্য সাজ আর কি হয় আমি ভেবে পাই না।

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে পরিবেশনের ধারা বদলাবে না, এমন কথা বলার মতো পুরোনো আঁকড়ে থাকা মানুষ আমি নই। আধুনিক sound system-এ গেয়ে

দেখেছি। অন্যের গান ত শুনেছিই। কোন কোন ক্ষেত্রে effect বেশ ভালই হয়। আসলে নূতনের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, বা পুরোনোর সঙ্গে আঁতাত। আমি খুঁজতে চাই যা চিরন্তন যা পুরোনোতেও ছিল আর যা নতুনের আবির্ভাবে শুকোয় না।

'কী গাব আমি কী শুনাব আজি আনন্দধামে।'
'আমি কি গান গাব যে ভেবে না পাই।'

রবীন্দ্রনাথের দুটি গানের লাইন। কি গাব আমিও যে খুব ভেবে পাই, তা নয়। তবে আমরা যেমন চাই, যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করব তা যেমন গ্রহণীয় হবে (আকর্ষণীয় হতে পারে, নাও হতে পারে) শেষ পর্যন্ত তা স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর এবং দোষমুক্ত হবে, তেমনি গানের কথা শেষ বিচারে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হবে এমন একটা ইচ্ছে কিন্তু আমার মাথায় থাকে। কোন অসুস্থ, ক্ষতিকর চিন্তা যেন গানের মত শক্তিশালী মাধ্যমের মধ্যে আশ্রয় না নিতে পারে—এদিকে হুঁশ রাখি। গানের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আমার কোন ছুঁৎমার্গ নেই, মানুষের অনুভবের নানা রঙ গানেও আসুক না। সুখ, দুঃখ আনন্দ বেদনা, ঘৃণা, ক্রোধ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, উল্লাস, হাহাকার আশা, হতাশা, সংগ্রাম প্রতিবাদ আর ভালোবাসা যা প্রায় সব অনুভবকেই ছুঁয়ে থাকে—এসবই আসুক গানে। যে গানগুলি থাকবার, সেগুলি ঠিকই থাকবে। এমন সব গান আমি নিজে লিখব এমন ক্ষমতা আমার নেই, আর সময়ও নেই। মাঝে মাঝে কিছু গান না লিখে পারিনা। কখনও কখনও পরিবেশ যেন জোর করে গান লিখিয়ে নেয়। ষাটের দশকের শেষ দিকে সেই বিক্ষুব্ধ সময়েই ত আমি গীতিকার হয়েছিলাম। গান লিখেছিলাম। যে সব কথা মনে হয়েছিল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন, তাদেরই গানের রূপ দিয়েছিলাম তখন, অন্যের কবিতায় বা গানে সুর দেবার সঙ্গে সঙ্গে। নাঃ, আমার লেখা গানে মৌলিক চিন্তা খোঁজার চেষ্টা না করাই ভালো। আমি সেরকম চিন্তানায়ক নই যে আমার চিন্তা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করব। আমি যাদের চিন্তানায়ক মনে করতাম, করি তাদের কথাকেই গানের রূপ দিই। মোজাম্বিকের জর্জ রেবেলোর একটি কবিতা—ইংরেজি অনুবাদে Come brother, tell me your life বাংলায় অনুবাদ করে গান করেছিলাম। তাতে এক মানুষ এক সংগ্রামী মানুষকে বলছে—তুমি তোমার স্বপ্নের কথা, তোমার দেশপ্রেমের কথা, তোমার সংগ্রামের

কথা বলো। আমি শুনব। তারপর—

'শব্দে শব্দ জুড়ে গড়ব কথা
সহজ সরল,
যে কথা শিশুরাও বুঝবে।

সে সব কথা হাওয়ার মতোই পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে,
সে সব কথা লাল গনগনে অঙ্গার হয়ে
ছড়িয়ে পড়বে কোণে কোণে
আমার দেশের লাখো লাখো মানুষের মনে।'

আমি নিজেও যেন সবাইকে অনুরোধ করছি—

'এসো বন্ধু বলো তোমার জীবনের কথা
শুনব, আমি শুনব তোমার মুখে।'

কবিদের বলি, সাহিত্যিকদের বলি, সংগ্রামীদের বলি, 'এসো বন্ধু বলো', তাঁদের কথা শুনি, তাঁদের কথাই আমি গানে নিয়ে আসি। আমাকে অনেকেই অনেক বেশি গান লিখতে বলেন। সময় নেই ত বটেই। কিন্তু তার সঙ্গে তেমন ক্ষমতাও যে নেই তা বলার মতো ক্ষমতা আমার আছে। অনেক কাজই ত করতে পারিনা। যে কাজ মাঝে মাঝে করছি, পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার পাইপের কাজ অথবা বাঁকে করে জল দেওয়ার ভারীর কাজ, সে কাজটাকে আমি কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনা।

আগেও বলেছি, গান তৈরির চিন্তাভাবনা গান না গেয়ে তুলে ধরার ভাষা আমার আয়ত্তে নেই। সারা জীবন গান শুনেছি, গান গেয়েছি, গানের সুর দিয়েছি চাকরিবাকরি আর সামান্য ঘরগেরস্থালির ফাঁকে। ঠিক যে খুঁজে খুঁজে শুনেছি তা নয়। যা কানের কাছে এসেছে বা শোনা গেছে বা কেউ ভালবেসে শুনিয়েছেন, তাই শুনেছি। যখন গান না লিখে পারিনি, লিখেছি। কখনও অন্যের গানে বা কবিতায় সুর দিয়েছি। কখনও কবিতাকে গানের রূপ দিয়ে সুর দিয়েছি। সুর দিয়েছি গেয়ে গেয়ে। কোন যন্ত্র বাজিয়ে নয়। তার ফলে গানটি মানুষের কাছে কিভাবে যাবে, তার একটা স্পষ্ট ধারণা সুর দেবার সময় গাইতে গাইতেই কিছুটা বুঝতে পারতাম। নিষ্ঠুর বিচারকের মতো নিজের গান নিজেই শুনতাম। যখন মনে হত, এটা বোধহয় হয়েছে তখন গাইতে গাইতে সেটিকে আমার সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম।

সেরকম হলে সুর ভুলবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। তারপর পরিচিত দু'এক জনকে শোনানোর পালা। তাদের মুখ দেখে (কথা শুনে ততটা নয়) বোঝা যায় এটা প্রকাশ্যে গাওয়ার মতো হয়েছে কিনা। সুর দেবার সময় মনে থাকে এটা আমাকেই গাইতে হবে। তার ফলে আমার গাওয়ার কোন শক্তি বা বিশেষত্ব সুরে সংক্রামিত হয়। আমার গাওয়ার সীমাবদ্ধতার হদিশও আমার সুরে পাওয়া যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত যে গানটি সৃষ্টি হবে তা আমারই উচ্চারণ—এরকম একটা ব্যাপার আমার গানে থেকে যায়। এক কথায় আমার গাওয়া গানে আমার শক্তি, দুর্বলতা, আমার শোনার ব্যাপ্তি, সীমাবদ্ধতা আমার পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়াস ধরা পড়তে পারে।

ধরা পড়তে পারে গানকে আমি কি চোখে দেখি বা কোন কানে শুনি তার রূপ। ধরা পড়তে পারে আমি কাকে সুন্দর বলি, ধরা পড়তে পরে নাটকের সঙ্গে গান কোথায় মেলে, মুখের কথা কিভাবে গান হয়ে যায়, গানের ছবি হয়ে ওঠা, নাকি ছবির গান হয়ে ওঠা। গানে চলচ্চিত্রের ভাষার প্রয়োগ—গানের আর ভাস্কর্যের মিল, যে ভাস্কর্যকে এক জায়গা থেকে দেখতে নেই, ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়। গলার তারতম্য (voice inflexion) ঘটিয়ে কিভাবে ঠিক (মানে আমার যা মনে হয়) আবেদনটি পৌছে দেবার চেষ্টা করা যায়। গানের মধ্য দিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। গানের মধ্য দিয়েই শ্রোতাদের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই।

যা বলছিলাম, আমার গানের উৎস হচ্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনা, পড়া, মানুষের সঙ্গে কথা বলা, আর তার মধ্যে খোঁজা—এর মধ্যে আমার অর্জন করার মতো কি আছে? কি লাগবে গানের কাজে। গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধের শব্দগুচ্ছ, একটি সুরের চলন—কণ্ঠসঙ্গীতে বা যন্ত্রসঙ্গীতে, কবিতার লাইন, ছবি, ভাস্কর্য স্থাপত্য। অনাড়ম্বর স্থাপত্যের গম্ভীর সুন্দর ছন্দ আমাকে গান নিয়ে ভাবায়।

চলচ্চিত্রে যেমন একই দৃশ্য একবার দূর থেকে দেখানো হয়, তারপর ক্যামেরা হঠাৎ এগিয়ে এসে সেই দৃশ্যকে খুব কাছ থেকে ধরে, তেমন কাজ করেছিলাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পাথরে পাথরে নাচে আগুন' কবিতায়। 'শীতের পাহাড় নাচে রাতের পাহাড় নাচে'—লাইন দুটির সুরে শীতের রাতের পাহাড় দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, বিলম্বিত টানা সুরে,—তারপরই হঠাৎ সুর ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন লাইন দুটির উপর। শ্রোতা দেখতে পান রাতের পাহাড়ে আগুন হাতে মানুষের নাচ।

ছবি বা চলচ্ছবির আদল পাওয়া যায় বোধহয় আমার 'ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে' গানে। সমুদ্রে উথালপাথাল তরঙ্গের মধ্যে ডিঙ্গার ছবিটি সামনে রেখে এর সুর। এক কৃষক দুহিতার কাছে শেখা একটি লোকগানের দু'কলি শিখেছিলাম। সেই দেশি লোকসুরের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের চলন মিশেছে এই গানে। 'ভাসাও ডিঙ্গা সাগরে' কথাটিকে গাওয়ার সময় গলার সামান্য হেরফেরে একবার করা হয়েছে উদাত্ত আহ্বান, আর একবার করা হয়েছে মধুরসুরে আকুল আবেদন। এই দুটি রূপই সমান গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত এই গানে। অন্তত আমি সেই চেষ্টা করেছি। দুবারই দৃপ্তভঙ্গীতে বা আবেদনের সুরে গাইলে গানের মেজাজ বদলে যাবে। স্বরলিপি কিন্তু এই তফাৎ দেখাতে পারবে না। Voice inflexion-এর নির্দেশ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরলিপিতে থাকতে পারে, আমি জানিনা কিছুই। শুনেছি পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে কোন স্কেলে গানটি ঠিক রূপ পাবে তার উল্লেখ থাকে। এটা আমার কাছে খুব জরুরী মনে হয়।

যে মানুষটি গভীর রাতে খরায় ফাটা মাটির উপর রক্তপায় হেঁটে চলছে 'দু একটা বীজ ভিজে' ওঠার আশায় আর মাদারির মতো হেঁকে বলছে 'এই আওয়াজ হয়ে যাবে এক মাঠ ধান', সেই মানুষটিকে আর সেই রাতকে সুরে আঁকার চেষ্টা করেছি 'নিসর্গের বুকে' কবিতার গানে। বৃদ্ধের শেষ বেপরোয়া হাঃ হাঃ হাসির মধ্যে একটা বুকফাটা হাহাকার চলে এসেছে সুরে। কিছুতেই তাকে আটকাতে পারিনি। এক চিত্রকরের লেখায় পড়েছি—ছবি আঁকার সময় প্রথমে আমি ছবির দিকে তাকাই, কিছুক্ষণ পরে ছবি স্বাধীনভাবে আমার দিকে তাকায়। নিসর্গের বুকে গানে সুর করার সময়ও এরকম একটা অনুভব হয়েছিল। কবিতা-গান একটা শরীর নিয়ে সামনে দাঁড়ায়। অরুণদাও গানটি শুনে এমন কথাই বলেছিলেন।

মনে পড়ছে চেরাবাণ্ডারাজুর 'আমাদের যেতে হবে দূরে' কবিতাটির নির্বাচিত অংশ সুর করবার কথা। সেখানে 'দূরে বহুদূরে' শব্দগুচ্ছের 'দূরে' শব্দটিতে 'দূ' অক্ষরটি যেন ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে অনেকদূরে—এই ছুঁড়ে দেওয়াটা কি শব্দ দিয়ে বোঝানো যায় জানিনা। 'রে' শব্দটির উচ্চারণে আমরা একটু পিছিয়ে এলাম —যতদূর যেতে হবে—দূরত্বের দ্যোতনাকে সম্পূর্ণ করতে। বহুদূরে কথাটি ভাঙা হয়েছে বহু দূ-উ-উ-উ-উ-উউ রে (সা রা গা সা রা সা প্া ধ্া ধ্া) এমনভাবে। আর এই উ গুলির স্বরের বিভিন্নতা বুঝিয়ে দেয় এই রাস্তা মোটেই সহজ নয়, এই দূরের রাস্তায় অনেক বাঁক, অনেক চড়াই উৎরাই। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনো

তিক্ততার বেদনার ছোঁয়া আনার চেষ্টা নেই, যা বোঝায় এই রাস্তাই ভালোবাসার রাস্তা। অনেক দুঃখ, অনেক বিপদ এই রাস্তায়, তবুও। তারপর অনিবার্যভাবে আসে পরের শব্দদুটি 'যেতে হবে' যা মনের মধ্যে প্রোথিত করে প্রেমসিঞ্চিত এক প্রত্যয়কে। এ গানটির সুর হয়েছিল ১৯৮৫ সালে 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার' নামে অনূদিত কবিতা সংকলন হাতে আসার পর। ১৯৮২ সালে ম্যানিফেস্টো-গণবিষাণ আয়োজিত চেরাবান্ডারাজুর স্মরণসভায় প্রদীপ গোস্বামী অনূদিত এই কবিতার গান শোনানোর সুযোগ হয়েছিল অনেক মানুষের সামনে, যাঁদের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, কিন্তু যাঁরা অনেকেই আমার পুরোনো গান চিনতেন। সেখানে এ গান শুনে একজন বলে উঠলেন—মনে হল প্যানোরামিক পর্দায় একটা ফিল্ম দেখলাম—সব দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠল। মন্তব্যটি বড়ো ভাল লেগেছিল।

পুরোনো গানের কথায় আর দূর যাত্রার কথায় 'লং মার্চ' ত মনে আসবেই। মাও-এর কবিতা কমলেশ সেনের অনুবাদে। সুর করেছিলাম মনে আছে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে। সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে মুখে শুরু হল 'লং মার্চ' গানের লং মার্চ। কোথায় না গিয়েছিল এই গান? কিন্তু সে কথার জায়গা এটা নয়। গানের সুরে মার্চের আদল আছে। গানে আবৃত্ত (repetitive) সুর আছে কিন্তু ভারী বুটের আওয়াজ বা ড্রামের অনুষঙ্গ ভাবিনি এ গানে। এ ত ড্রাম বাজিয়ে সেনাবাহিনীর মার্চ নয়। এ কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকৃতিবর্ণনা, তাই সুরেও আনতে হয়েছে এক সজীব সৌন্দর্য আর নির্ভয় / ঋজুতার সমন্বয়। মনে আছে 'লাফিয়ে হই পার' এই শব্দগুচ্ছের সুর শেখাতে ভাইদের (জেন-অপু) আর তাদের বন্ধুদের বলতাম—লাফিয়ে হই পার নয়, বল ল্লাফিয়ে হই পার—তবে না leapটা বোঝা যাবে। উমুং পাহাড়কে মাটির টিলা বলার মধ্যে স্পর্ধার সুর আবার 'কি সবুজ আহা' বলার সময় সবুজ রঙ হয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার রঙ, সেখানে সুর মধুর। ভালোবাসায় ভেজানো সুর। সুর দেবার সময় এ সব ভাবতাম। শুধুই সাঙ্গীতিক অধ্যয়নের মধ্যে এ ব্যাপারটা ধরা যেত কি? বোধহয় না। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে গানকে দেখার ফলে আমার পক্ষে কাজটা সহজ হয়েছে।

মিরোশ্লাভ হোলুভ এর 'মৃতভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক' কবিতাটির (মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত) গানে পড়ুয়াদের একঘেঁয়ে পড়ার সুরকে ব্যবহার করা হয়েছে আস্তে আস্তে সেই সুরের উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। একটি বাঙ্ময় interlude পরিবেশ বদলে দিচ্ছে। জাক প্রেভর-এর 'মা সেলাই করে'

কবিতাটির (বাদল সরকার অনুদিত) গানেও সেই monotony গানকে প্রাণবন্ত করে, interlude চেতনাকে গভীর করে, (করে কথাটা আমার প্রয়াসের ইঙ্গিত দিচ্ছে মাত্র, সত্যি করে কিনা সেটা ত শ্রোতারাই বলবেন।) এবং শেষের এক সুর জীবন আর তার সমাধির ছবির সঙ্গে মিশে যায়। কোথা থেকে পেলাম সে সুর বলতে পারি না। কখন আমার মস্তিষ্কের কোন কোষে, আমার দীন-ভিখারীর ঝোলায় সে সুর জায়গা নিয়েছিল, কে জানে?

আমার মতো মানুষকে দিয়েই যদি এ কাজ সম্ভব হয়, তবে যাঁদের সাঙ্গীতিক জ্ঞান গভীর ও ব্যাপ্ত, তাঁরা আমাদের বাংলা গানকে কোথায় নিয়ে যেতে পারেন, ভাবা যায় না। জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপ্তি এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পকলার ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা interdisciplinay approach সব শিল্পকলারই উত্তরণ ঘটাতে পারে। এই interdisciplinay approach শুধু কবিতার চিত্ররূপ বা সঙ্গীতরূপ, মঞ্চস্থাপত্যে বা আলোকসম্পাতে শিল্পীর বা প্রযুক্তিবিদের ভূমিকা, নাটকে বা চলচ্চিত্রে গানের বা সঙ্গীতের ব্যবহার—এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ধরা যাক ছবির ক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তার জোয়ার এল, তার প্রতিফলন কতটা হল আমাদের সাহিত্যে, গানে, চলচ্চিত্রে? আন্দোলনটা ত সবাই মিলে করবার। কবি বিষ্ণু দে যামিনী রায়ের অনুরাগী ছিলেন—কিন্তু যামিনী রায়ের ছবির চিন্তা কিভাবে কাব্য বা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে ভাবিয়েছে, তার কোনো মূল্যায়ন হয়েছে কি? হয়েছে নিশ্চয়ই। জানতে ইচ্ছে করে। এত কম পড়েছি। এক প্রবীণ সাহিত্যিক আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন—স্মৃতি থেকে বলছি—আমি প্রেরণা পাই ছবি থেকে, গান থেকে। পরে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন—'তোমার গান আমার গদ্যরীতিকে বদলে দেবে। তুমি যে লিখেছ না—আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই—তা আমাকে চিনিয়েছে 'বিভক্তির' শক্তি।' এ সব কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে—সেটা ভালো, না খারাপ বলতে পারব না। তবে এটা বুঝতে পারি, গান নিতান্তই এক বিনোদনের আর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অবসর কাটানোর জিনিস নয়—বিনোদনের ভূমিকা অস্বীকার না করেই বলছি। মানুষের মনে যে গান গভীর ছাপ ফেলতে পারে, তার সঙ্গে প্রবহমান জীবনের যোগ ত থাকবেই। গানের গভীর সঙ্গীতশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার ভূমিকা অস্বীকার না করেই বলছি। তাঁর কাজ একই সঙ্গে মন ও মননের। বাংলা গানেও এ কাজ আগে হয়েছে, কখনও বেশি, কখনও কম—রবীন্দ্রনাথ ত এ বিষয়ে এক আলোক-স্তম্ভ। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীর মতো দিশারীরা আছেন। এখনও

এ কাজ হচ্ছে এবং আরও হবে। যে প্রচলিত গানের লাইন ব্যবহার করেছিলাম একেবারে প্রথম দিকে তার আর দুটি লাইন বলতে ইচ্ছে করছে—

(১) ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন

(২) দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ

রূপসাগরে ত ডুব দিতে হবেই। কিন্তু জ্ঞানের বাতি জ্বালতে গেলে চারপাশে কি হচ্ছে তাও ত জানতেই হবে। ডাঙায় ডিঙা চালাবার চেষ্টা ছাড়তে হবে।

গানের ক্ষেত্রে কেন, সবক্ষেত্রেই আবেগ আসুক তার সঙ্গে মননের চর্চা হোক। কিন্তু এক কৃত্রিম মনন যেন আমাদের মাটি থেকে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে। মাটিতে পা রেখে মানুষের দিকে চোখ রেখে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য, নাটক, চিত্র, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত একসঙ্গে হাঁটুক, সবাই সবাইকে আরও গভীরভাবে চিনুক ও নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করুক। নিজে সমৃদ্ধ হোক এবং একে অন্যকে সমৃদ্ধ করুক। জানি, এ কোনো নতুন কথা নয়। পুরোনো কথা। কিন্তু বারবার বলতে দোষ কি? ওই যেমন অরুণ মিত্র বলেন—'পুরোনো নাম, ঘুরে ফিরে একই নাম ভালোবাসা।' শুধু গানের মানুষ নয়, শিল্প বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার মানুষের ভালোবাসায় আমি ধন্য। নেবার চেষ্টা করেছি তাঁদের কাছ থেকে, কিন্তু আমার পাত্রখানি যে বড়ই ছোট।

নিঃসঙ্গ আলাপের এই মুশকিল। কেউ বলেন না—'ওরে এইবার উঠতে হবে। বাড়ীতে.....' অনেক আগেই থামানো উচিত ছিল। যে 'মাপের' কথা বলেছি সে 'মাপের' কথা মনে রাখিনি এখানে। আমি একেবারেই অপ্রশিক্ষিত কর্মী। আমার কাজে চিন্তায় ভুল থাকতেই পারে। আপনারা আমার ভুল দেখিয়ে দিন—আমাকে কাজ চালানোর মত শিক্ষিত করে নিন। শিখবার আর ভুল শুধরে নেবার চেষ্টা ত সারাজীবন চালাতে হবে।

□ □ □

বীরেনদার কবিতা আমার গান

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের বাংলা কাব্যগীতির সুরে লালিত, ষাটের দশকের শুরুতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে পুষ্ট, ষাটের দশকের শেষের উত্তাল সময়ের গণসঙ্গীতকার, সত্তরের দশকের অনেকটা জুড়ে নাটকের গানের গীতিকার ও সুরকার, আশির দশকের শুরুতে চেরবাণ্ডারাজুর কবিতার গীতিরূপকারের কিভাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার গীতিরূপকার হয়ে আত্মপ্রকাশ হল, সে কাহিনী আত্ম-কথার মত। অনেক সুর, অনেক মানুষের ভালোবাসা, আবেগ, অভিমান আছে সে কাহিনীতে। সে কথা লিখতে গেলে কলম থামতে চায়না, চোখে জল আসে। কিন্তু সে কথা লেখার জায়গা এটা নয়। বীরেনদার কবিতার গীতিরূপকার হিসেবে আমার ভাবনা ও অনুভবের কথাই লিখতে অনুরোধ করছেন বীরেন্দ্রপত্রের সম্পাদক। এ অনুরোধ পেয়ে আমি একই সঙ্গে অভিভূত, গর্বিত, অসহায় ও বিপন্ন বোধ করছি। গান না গেয়ে সুরের অনুভবের কথা বলবার জন্য কাব্য ও সঙ্গীতের ওপর যে দখল থাকা প্রয়োজন, তা আমার নেই। তাই যা বলব, আমার মতো করেই বলব। সম্পাদক ও পাঠকের কাছে আমার দুর্বলতার জন্য মার্জনা চেয়ে রাখছি।

১

১৯৮৫-র ফেব্রুয়ারিতে প্রথম বীরেনদার কবিতায় সুর দিই। কবিতার প্রথম লাইন 'ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়'। জ্যোৎস্নালোকিত ফুটপাতে ক্ষুধাজর্জর উলঙ্গ শিশু আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তার কপালে চাঁদের স্নেহ-চুম্বন। মা লুকিয়ে চোখের জল মোছেন। শান্ত, আশ্চর্য সুন্দর এই ছবির মধ্যে যে তীব্র বেদনা, তা আনতে চাইছি সুরে। গুনগুন করে অবিশ্রান্ত গান গেয়ে যাচ্ছি। 'পিলু'র সুর দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল—সে সুর বদলে যাচ্ছে কবিতার দাবিতে। অলঙ্করণের প্রলোভন দূরে সরিয়ে দিচ্ছি নিষ্ঠুরের মত। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বীরেনদার কবিতা এখন আমার গান।

২

কবিতার গীতিরূপের কাজ এ পর্যন্ত খুব কম করিনি। কিন্তু বীরেনদা ছাড়া আর কোন কবির এত বেশি কবিতা নিয়ে কাজ করা হয়ে ওঠেনি আমার। এ

পর্যন্ত বীরেনদার ২৩টি কবিতার গীতিরূপ দেবার চেষ্টা করেছি। সংখ্যা মোটেই সব কথা বলেনা এ কথা মেনে নিয়েও তথ্যটি উল্লেখ্য। সংখ্যা ছাড়া আর একটি উল্লেখ্য দিক্ হচ্ছে গীতিরূপের প্রবহমানতা। ২৩টি কবিতার মধ্যে ১৮টিরই সুর হয়েছে ১৯৮৫তে। বীরেনদার বিদায়ের বছর আর বীরেনদার কাব্যজগতে আমার সুর নিয়ে প্রবেশের বছর। এ কেমন করে হল? বীরেনদার কবিতা কি সুরের ডাকে বেশি সাড়া দেয়? বীরেনদাকে তাঁর কবিতার গান শোনাতে হবে—আর বেশি সময় নেই, এ চিন্তাই কি ছিল আমার মধ্যে? ঠিক বলতে পারছি না তবে এটা মনে করতে পারি, তখন আমার চেতনায় চিন্তায় বীরেনদার কবিতার পদসঞ্চার। তাঁর কবিতাকে সুর দিয়ে ছোঁয়ার সাধনায় যেন মগ্ন ছিলাম আমি। নিজেকে নিজের বাইরে নিয়ে গিয়ে আর একটি দিক্ লক্ষ করছি। ১৯৮৫ বছরটি সুরকার হিসেবে আমার সবচেয়ে সৃজনশীল সময়ের মধ্যে একটি। ১৯৮৫-র শুরু থেকেই আমি গানের সুর নিয়ে নতুন করে ভাবছি—অবশ্যই আমার সাধ্যমত। বাঁধা সড়কের বাইরে পা দেওয়া, চেনা সুরের নতুন করে প্রয়োগ, বিভিন্ন ধরনের সুরের ও গায়নভঙ্গীর মিশ্রণ, এ সময়ের সুরে বেশি করে দেখতে পাচ্ছি।

খুব ছোট কবিতা, আগে ভাবতাম, গান না করাই ভাল। সে ধারণা ভেঙে ফেলেছি। নমিতা চৌধুরীর 'ফাল্গুন' কবিতার গান শুরু করেছি 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ...'রবীন্দ্রসঙ্গীতের আদলে, আবার সরেও এসেছি সে সুর থেকে। 'অন্ধকারে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে রাধা' যে কবিতার প্রথম লাইন, সেখানে কীর্তনের সুর এনেছি। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত শাহীর লুধিয়ানভির কবিতার গানে আমার প্রিয় গায়িকা বেগম আখতারের গজলের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর মিশেছে। রঞ্জিত গুপ্তের 'রাজা আমার রাজা' কবিতায় পুরাতনী গানের চলন আর ধ্রুবপদের ব্যবহার করেছি। আমার মতে কবিতার গীতিরূপে আমার সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজ অরুণ মিত্রের 'নিসর্গের বুকে' কবিতার গীতিরূপও হয়েছিল ১৯৮৫তেই। এই অনুসৃজন (transcreation) ও মিশ্রণের প্রয়াস বীরেনদার কবিতার গীতিরূপেও বারবার হয়েছে। সার্থক হয়েছে কিনা, তা শ্রোতারাই বলতে পারবেন। সুরকারের ভাবনা গান থেকেই বোঝা যায়। যেহেতু আমার বেশির ভাগ গানই অগ্রন্থিত, খুব বেশি প্রচারিতও নয়, তাই বীরেনদার কয়েকটি কবিতার সুরে আমার ভাবনা ও প্রয়াসের কথা বলি।

• 'বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলা' (যার প্রথম লাইন, 'সেই মেয়েটি বাজিয়েছিল তালপাতার এক বাঁশি') কবিতাটির মধ্যমণি 'রবি ঠাকুর'। গানটি

সাজিয়েছিলাম নানা জায়গায় ছড়ানো রবীন্দ্রনাথের সুরে। দেখেছিলাম, কথার সঙ্গে সুর কি আশ্চর্যভাবে মিশে যাচ্ছে। খুব আনন্দ হয়েছিল সুর করে। এ গান শোনানোর পর কয়েকজন কৌতুকের হাসি হেসেছেন, কেউ বলেছেন 'এত প্যারডির মত হল।' মনের দুঃখে সে গান আর গাইনি। পাঁচ বছর পর সঙ্কোচের সঙ্গে বন্ধু সঙ্গীতশিল্পী অমিত রায়কে শোনাতে তিনি বললেন, এটি চমৎকার কাজ হয়েছে। তারই অনুরোধে একটি অনুষ্ঠানে এ গান গাই। অনেক কবি ও শিল্পী গানটির প্রশংসা করলেন।

চেনা সুরের সচেতন আরোপ আরও কিছু কবিতায় এসেছে। পল রোবসনকে নিবেদিত 'তুমি পৃথিবীর কালো মানুষের গান' কবিতাতে অন্য সুরের সঙ্গে এসেছে 'Ole man river'-এর সুর। 'বাছা আমার গিরগিটির ছা' ছড়ায় রামধুন গায় পর্যায়ে হঠাৎ আগের সুর থেকে সরে গিয়ে রামধুনের সুর বোধ হয় Satire-কে সাহায্য করে। তবে এগুলিকে কেউ 'obvious' বা 'এ ত হবেই' বলতে পারেন।

ঠিক obvious নয়, এমন প্রয়াস 'বেকার জীবনের পাঁচালি'তে যেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গানের সুরের আভাস। আর দুই স্তবকের মধ্যে নজরুলের উদ্দীপ্ত নওজোয়ানের গান 'উর্ধগগনে বাজে মাদল' এর সুর বিলম্বিত লয়ে বিষন্ন-রূপ নিয়ে পথ চলেছে। 'ছোকরা চাঁদ' কবিতার গীতিরূপান্তরে আফ্রিকার Rhythm, দেশী বিদেশী সুর মিশে গেছে, মনে হয় দেশী লোকগীতির সুর দ্রুতলয়ে অন্য রূপ নিয়েছে। তার সঙ্গে শ্রমজাত জোরালো নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ আর হেঃ হেঃর মত shoutকে কাজে লাগানো হয়েছে। একটি দ্রুতলয়ের প্রায় নাচের সুরে সেই চিরন্তন প্রশ্নটি ধরবার চেষ্টা করেছি। এই আনন্দ, হাসি, সৌন্দর্য মুগ্ধতা মাধুর্যের আড়ালে বেদনা, বিষাদ, বিদ্রূপ, তিক্ততা বীরেনদার অনেক কবিতায় পেয়েছি। এইটিকে ধরতে পারা সুরকারদের কাছে Challenge এর মত আসে। 'গাধা' কবিতার (একদা এক রামছাগল) সুরে ছোটদের ছড়ার মজাদার স্বাভাবিক ছন্দ আছে, বড়রা কিন্তু তার মধ্যে একটা বিষাদের সুর খুঁজে পাবেন। বিশেষ করে গাধার ডাকের চলনের (অনেক উঁচু Pitch থেকে প্রায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসা—Diminuendo মাঝে মাঝে হাঁপ ধরার শব্দ) সুরানুকৃতিতে নিপীড়িতের বুকফাটা আর্তি আর হাহাকারের সন্ধান করেছি।

'পাথরে পাথরে নাচে আগুন' গানের আবহ পরিকল্পনায় দীপক চৌধুরী আগের সংখ্যায় যে ভাবনার কথা লিখেছেন—তা আমার সুরের ভাবনার সঙ্গে সুন্দর মিলে যাচ্ছে। সুরকার হিসেবে দু-একটি কথা যোগ করি। 'শীতের পাহাড় নাচে

রাতের পাহাড় নাচে' লাইনদুটির সুরের Variation-এ পাহাড় আর আগুন হাতে লং মার্চের যাত্রীদের কখনও অনেক দূর থেকে, কখনও খুব কাছ থেকে, অনেকটা ফিল্মের আঙ্গিকে দেখাতে চেয়েছি। রাত শেষের বন্দীর যে চোখে স্বপ্ন সে চোখে অশ্রুও দেখেছিলাম সুরারোপের সময়।

'লাল টুকটুক নিশান ছিল' কবিতায় বীরেনদার বিষণ্ণ বিদ্রূপ আপাত মিষ্টি-সুরে ধরতে পেরেছি কি? বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবীর দৃপ্ত ঘোষণার পর কিন্তু এখন শান্তি শান্তি'র সুরের কথা মনে করতে বলছি। আসলে সুরই সব নয়, এ-গানে Presentation-এর একটি বড়ো ভূমিকা আছে।

'মে-দিন বন্দীজীবনের গান' (বাইরে এখন হাজার হাজার লাল পতাকা) কবিতার সুরে নজরুলের 'কারার ওই লৌহকপাট'-এর ছায়া কি দেখতে পাওয়া যায়? আমার সুরের যাত্রা কিন্তু সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল। আগে কোথায় পড়েছিলাম, পরে সেদিন বীরেনদার প্রয়ান দিনের অনুষ্ঠানে সুরজিৎ ঘোষের কথায় ভাল করে জানলাম, নজরুল ইসলাম বীরেনদার কত প্রিয় কবি ছিলেন। আমার সেদিন মনে হয়েছিল, কোথায় যেন সব মিলে যাচ্ছে। সুর দিতে বোধহয় ভুল হয়নি।

সুরকারের সচেতন প্রয়াসের কথা বাদ দিলেও সুরকারের কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও সুরের মধ্যে এসে যায়। আমি যেহেতু গাইতে গাইতে সুর করি, আমার গাইবার নিজস্ব ধরন বা Style বলে যদি কিছু থাকে তার প্রভাবও নিশ্চয়ই সুরের মধ্যে এসে পড়েছে। তা ছাড়া বোধ বা ভাবনার দিক্ থেকে কবিতা আমার কাছে যে রূপ নিয়ে আসে, সুরও আসতে চায় সেভাবে। একই কবিতা অন্য সুরকারের কাছে আর এক রূপের দ্যোতনা আনতেই পারে। 'তুই' কবিতাতে বিনয় চক্রবর্তীর ও আমার সুরের কথা মনে করা যেতে পারে। বিনয়ের সুরটি আমার খুব প্রিয়। কিন্তু ও সুর আমার থেকে আসত না কখনোই।

গান না গেয়ে শুধু লিখে কিছুই হয়ত প্রকাশ করা গেল না। সাঙ্গীতিক দৃষ্টি-কোণে বীরেনদার কবিতার গীতিরূপের বিশ্লেষণ যদি কোন সঙ্গীতবিদ্ করতেন, তা হলে আমার খুব উপকার হত। কি কাজ করেছি, তা আমার থেকে তিনি অনেক ভাল বুঝবেন এবং বোঝাতে পারবেন। তিনি বলতে পারতেন, কোথায় আমার জোর। কোথায় আমার দুর্বলতা, তিনি ধরিয়ে দিতেন সহানুভূতির সঙ্গে। আমি সাধ্যমত আমার ত্রুটি শুধরে নিতে পারতাম।

৩.

কবিতায় সুরারোপ বা কবিতার গীতিরূপায়ণ নিয়ে এতদিনে অনেক আলোচনা

হয়েছে। কবিদের নিজেদের কবিতার সার্থক গীতায়নে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি, আবার অসার্থক সুরারোপের কথা উল্লেখ করে হতাশা বা বিরক্তি প্রকাশ করতেও দেখেছি। দুটিই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। আবৃত্তি বা সুরে 'মঞ্চসাফল্যের' দিকে বেশি লক্ষ্য রাখার প্রবণতা থাকতে পারে। এ নিয়ে বিতর্ক ঠিক ফুরিয়ে যাবার নয়। কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যম। 'হয়ে ওঠার' জন্য তার গানের সুরের প্রয়োজন নেই। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ত কবি নিজেই গেয়ে ওঠেন—যেমন উর্দু বা হিন্দী কবিতার মুশায়রা বা কবি সম্মেলনে শুনতে পাই। লক্ষ করবার মতো, সেখানে কোন কোন কবি কিন্তু খালি গলায় খুব সুন্দর গান করেন। অরুণদার মুখে শুনেছি ফ্রান্সে অনেক বড় কবির কবিতাই গানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। সেখানে কবি সুরকার ও গায়কদের মধ্যে একটি সুন্দর যোগাযোগ ও বোঝাপড়া আছে। তবে বিদেশ বা অন্য প্রদেশের অভিজ্ঞতাকে বাংলায় রাতারাতি রোপন করা যায়না তাও জানি।

কোনো কবিতার সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা গড়ে উঠলেই সুরকারের মনে হতে পারে—এ কবিতার বাণীতে গানের সুরের ছোঁয়া লাগলেও কবিতার Personality ক্ষুন্ন হবে না—কবিতাকে আর এক রূপে দেখা যাবে, যা শিল্পের বিচারে রসোত্তীর্ণ। নইলে ব্যাপারটা জবরদস্তিতে পর্যবসিত হয়। ভাব ও সুরের প্রেম গভীর হলেই কথা ও সুর পরস্পরের শর্ত মেনে নেয় এবং একসাথে চলে সহজভাবে। 'একসাথে চলা' কথাটির উপর একটু জোর দিচ্ছি। কবিতার গীতিরূপের সময় সুর কবিতাকে প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত অনুসরণ করবে—এমন ধারণাও ঠিক বলে মনে হয় না। কবিতা যখন গান হয়ে ওঠে, কবিতার কথা ও গানের সুর Partner। সুরের Partner হবার আকাংক্ষা আসে স্পর্ধা থেকে নয়, ভালোবাসা থেকে। অনুচর হলে তো এই ভালবাসা আসেনা। কে না জানে মনিবকে 'মান্যি' করা যায়, ঠিক ভালোবাসা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' কথাটিকে একটু বদলে বলা যায়—কবিতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে কবিতা। কবি প্রিয়কে কবিতা করেন। গীতিরূপকার কবিতাকে প্রিয় করেন। কবিতাকে প্রিয় না করলে সুরের স্ফূর্তি সম্ভব নয়।

কবিতার গীতিরূপের সময় আমি কবিতাকে প্রিয় করে নিই। সুরের চোখে কোনো কোন কবিতা দেখলে মনে হয়—'এ ত আমার মনের কথা, আমার কথা। লিখতে পারিনা তাই। পারলে একথাই লিখতাম। আমি আমার কথা আমার সুরে বলব, এর মধ্যে দুশ্চিন্তার কি আছে?' এই সমমর্মিতা বীরেনদার

অনেক কবিতায় অনুভব করা যায়। কবিতা যেন হাত বাড়িয়ে দেয় সুরের কাছে। বলে 'এসো হাত ধরো।'

হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একসাথে চলা শুরু হয়না। একটি সার্থক Expression-কে অন্য Expression-এ পরিণত করা খুবই ঝুঁকির কাজ। গানের Expression-কে কবিতার Expression-এর সঙ্গে মেলানো—একটি সহজ অনায়াস ভাব বজায় রেখে—এ ব্যাপারটা খুব সহজে হয়ে ওঠেনা। এখানেই সুরকার বা গীতিরূপকারের নিজের ক্ষমতার মূল্যায়নের প্রশ্ন এসে পড়ে। তখন নিজেকেই হতে হয় নিজের কঠোর বিচারক। অনেক সময় হাত ধরার পরও নিজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে সরে আসতে হয়। তখন সরে আসাই ভালো। Expression-এর প্রাণ হল মাত্রাজ্ঞান বা পরিমিতি বোধ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখবার মতো। 'Expression বলতে প্রত্যেক আর্টের যে লসাগু বোঝা যায় সেটি ওজন-জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। ভাবের কতটা প্রকাশ করলে, কথার, রঙের, লাইনের, স্বরের, পাথরের আঁশের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি প্রকাশিত হবে—এই বুঝতে পারলেই আর্টিস্ট হওয়া যায়। এই প্রকাশ করার নামই ওজন-জ্ঞান। যে প্রকাশ করতে পারে সে ব্যক্তিই Preson, Original এবং তারই Expression আছে, অন্যের নেই। যাকে feeling for the Medium বলে, তার নামই Expression।' [সুরের কথা, আমরা ও তাঁহারা]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত নিয়েও বিতর্ক চলতে পারে। তবে ওজন-জ্ঞান ও feeling for the Medium-এর গুরুত্ব মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। গীতিরূপকার বা সুরকারের স্বতঃস্ফূর্তির ওপর নির্ভর করলে চলে না। স্ফূর্তিকেও নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। Feeling for poetry এবং Feeling for Music—দুই-ই অর্জন করতে হয়। বীরেনদার মত কবিদের কবিতা নিয়ে কাজ করতে হলে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, তা হল Feeling for people এই ত্রিধারা যেখানে মেশে সেদিকেই যাত্রা করতে হবে তাঁর কবিতার সুরকার ও গায়কদের। এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে। নিরন্তর প্রয়াস আর ঘরের মানুষ, হাতের কাছের, বুকের কাছের মানুষের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা সঙ্গে থাকলে বহুদূর যাওয়া সম্ভব। রাস্তায় জিন্দাবাদ নিন্দাবাদ দুই শোনা যাবে। আরও আরও এগিয়ে যেতে, ভুল পথ শুধরে নিতে দুই-এরই প্রয়োজন আছে।

অনেক কথা বললাম। এত কথা বলার অধিকার যে অর্জন করিনি তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? তবে স্বপ্ন দেখার, স্বপ্ন দেখানোর ইচ্ছে ত' সবারই থাকতে পারে। সেই ইচ্ছে থেকেই কথাগুলো বলা।

৪

অনুষ্ঠানে বীরেনদাকে গান শুনিয়েছি। কিন্তু তার সামনে আমার সুরে তাঁর কবিতার গান শোনাতে পারিনি। আমি যখন বীরেনদার কবিতার সুর দিচ্ছি, তখন তিনি যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তখনও তাঁর সৃষ্টি অব্যাহত।

রোগশয্যায় হাসপাতালে দেখা করেছিলাম তাঁর সঙ্গে। আমার হাত ছুঁয়ে তিনি বললেন, তুমি কি শুধুই গান গাও? লেখো না?' আমি বলেছিলাম—গান লিখি। সে বছর তারপর একটি গানই লিখেছিলাম—যার মধ্যে বীরেনদা বীরেনদার কবিতাকে নিয়ে আমার অনুভবের কথা বলেছিলাম বীরেনদার অমর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত গানে।

ঝিরঝির বৃষ্টিঝরা আষাঢ়ের এক দিনে
শ্মশানে আগুন বুঝি আগুন নিল চিনে।
আগুন ডাকে আয়রে বীরেন, তুই ত আমার ভাই—
হাজার মানুষ দেখুক কেমন দুই-এ মিশে যাই।
তুই প্রতিবাদের রাঙা আগুন
ভয়ের শিকল ভাঙা আগুন।
ভালোবাসার আগুন যে তুই।
তুলনা তোর নাই।
যে আগুনে ফুটপাতে মা ফোটায় গরম ভাত,
যে আগুন জেবলে গরীব মানুষ কাটায় শীতের রাত,
সেই আগুন বরণ করতে আগুন বাড়িয়ে দেয় হাত।
আগুন হ'ল আগুনময়
জয় আগুনের জয়—
তার আলোয় পড়ি জন্মভূমির বর্ণপরিচয়।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান

পর্যালোচনা/সমালোচনা/মতামত

সুমনই ঠিক, লোকটা একটা আস্ত গান

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানকে কোন শ্রেণীতে ফেলবো? গণসঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত না মানুষের গান বা জীবনের গান? গোর্কি সদনে তার সেদিনের নির্বাচনে স্বরচিত বহু গানের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন বিখ্যাত বা অখ্যাত কবিদের কবিতায় তাঁর সুরারোপিত গান। তাঁর গানে কখনো বাংলার বাউল, পাঁচালি, কথকতার সুর আবার কখনো বা আফ্রিকান ফোক, নিগ্রো স্পিরিচুয়াল বা আমেরিকান কান্ট্রি সাং-এর সুর—কখনো বা সরাসরি চ্যাপলিনের লাইম-লাইটের থিম। প্রায়ই তিনি ওরেটোরিওর ঢং-এ গানের ইন্টারল্যুড গেয়ে ওঠেন। তাঁর নিজের লেখা গানগুলোতে তিনি সহজ-সরল ভাষার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ওরই মধ্যে শব্দের ছোট্ট মোচড়ে তাকে শাণিত করে তুলেছেন। যেমন, ১৪০০ সালের উপলক্ষে লেখা গানটিতে 'আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই'। এরকম আরও নিদর্শন আছে। কবিদের রচনার মধ্যে তিনি যেমন একদিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অন্নদাশংকর রায়, শঙ্খ ঘোষ থেকে শুরু করে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহাকর ভট্টাচার্য, সমীর রায় বা অসীম মন্ডলের কবিতায় সুরারোপ করেছেন তেমনই আবার মাও সে তুং বা চেরাবান্ডা রাজুর বাংলা অনুবাদও ছিল তাঁর গানের তালিকায়। বিশেষ কিছু গানকে আলাদাভাবে চিহ্নিত না করে বলা যায় তাঁর সেদিনের সমস্ত নিবেদনটিই ছিল অনবদ্য, অভূতপূর্ব।

পার্থ সেনগুপ্ত ৪ অক্টোবর ১৯৯৩ প্রতিদিন

তাজা প্রাণের গান

১৬ অক্টোবর প্রতুলের গানের উদ্যোক্তা ছিল 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি'র মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে। তবে এদিন প্রতুল বেশি গান করেন প্রয়াত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে। প্রতুল যখন খালি গলায় কোনও যন্ত্র ছাড়াই গেয়ে ওঠেন, 'পাথরে পাথরে নাচে আগুন...' তখন সত্যি যেন বুকের মধ্যে আগুনের একটা হল্কা বয়ে যায়। কিংবা যখন প্রতুল গেয়ে ওঠেন 'অনেক দূর যেতে হবে', তখন শ্রোতারা

ভাবেন, সত্যি তো, হেঁটে অনেকদূরে যাওয়া হয়নি। এবারে যেতে হবে। পঁচিশ বছর আগে হয়ে যাওয়া নকশাল আন্দোলন যে এখনও শেষ হয়ে যায়নি তার প্রমাণ দিলেন প্রতুল, 'টকটকে লাল নিশানটাকে তুলে ধর' গেয়ে। এক কথায় বলতে গেলে, সেদিন প্রতুল প্রতিবাদ করেছেন সমস্ত ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। কেন এখনও শিশু শ্রমিকদের বেগার খাটানো হচ্ছে, কেন নারীরা এখনও পুড়ছে সমাজের আগুনে, কেনই বা সমাজটা পরিবর্তন করা দরকার, তার প্রতিটি যুক্তি গানের মাধ্যমে বোঝালেন অপতিরোধ্য প্রতুল। গানের মাধ্যমেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এগিয়ে যাবার গান, স্বপ্নের গান তিনি আজীবন গাইবেন। আর সেটা পরিষ্কার হয়, যখন রবীন্দ্রসদনের সমস্ত দর্শক-শ্রোতা প্রতুলের সঙ্গে গলা মেলায় 'ডিঙা ভাসানোর গানে'।

২৭ অক্টোবর ১৯৯৩ আজকাল

Power of simple songs

ANNESWAN'S evening with Pratul Mukherjee at the Gorky Sadan was a moving affirmation of the power of a simple song. He has that ability to recognize the need of an era. Pratul's style is an extremely personalized one. The way he acts out his songs makes them remain in the mind. He is unique in that he needs no acompaniment. Yet his songs grip the imagination through the sheer power of communication.

The evening was a kind of a retrospective in terms of songs. The singer who created songs for humanity and not for fame and wealth took listeners back to the end of the sixties to thoughts of a liberated motherland. Dreams then had yet been shattered. The songs of this period were 'Mukto habe priyo matribhumi", "Jan-mile morite habe" and "Amar mago tor chokhe keno jaler dhara". Pratul Mukherjee has always regarded himself on the lines of a Charankabi mirroring the times and events around him. Joy, sorrows, pain, struggles for life and for idealogy are his subjects.

The songs have been heard many times before. But each time he sings them he adds something new making it a continuous creative

process. "Slogan dite giye", "Alu bacho chola bacho", "Pathare pathare nache agun" and "Chokra chand jawan chand" (by Biren Chatterjee), Cherabanda Raju's "Ki amader jat ar dharmai ba ke" (translated by Shankho Ghose) have lost none of their sense of immediacy or the ability to move.

The Statesman, October 30, 1993

তোমার আছে বন্দুক, আমার আছে ক্ষুধা

'তোমার আছে বন্দুক, কারণ আমার আছে ক্ষুধা'। গুয়াতেমালার এক কবির লেখা গান। হুবহু প্রাসঙ্গিক আজ তেলেনিপাড়ার ভুখা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, এই গানটিই ভিক্টোরিয়া জুট মিলের গুলি-খাওয়া, অনাহারক্লিষ্ট, বঞ্চিত শ্রমিকদের উদ্দেশে নিবেদন করলেন জীবন-গানের শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে। শনিবারের রাত ন'টায় আচ্ছাদনহীন মাঠে, হিমে-ভেজা ঘাসের আসনে বসে প্রায় হাজার খানেক মানুষ তখন সত্যিই তেলেনি-পাড়ার সমব্যথী হয়ে উঠেছেন।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩, আজকাল

স্বপ্নের গানকে চিন্তার গানে পরিণত করেন প্রতুল

অন্বেষণ নিবেদিত গাথানি প্রকাশিত 'যেতে হবে' ক্যাসেটটিতে অবশ্য এই একান্ত ব্যক্তিগত দোলাচলকে সথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করেছে। 'আমার মাগো তোর চোখে কেন জলের ধারা' থেকে শুরু করে যোদ্ধার ইতিহাসকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লঙ মার্চের গানে। পার্থ বন্দোপাধ্যায়ের কবিতা স্লোগানকে গানের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, শিশু শ্রমিকদের নিয়ে গান বেঁধেছেন। জীবনযাপনের আর্তিকে চূড়ান্ত আশাবাদে নিয়ে গিয়ে অরুণ মিত্রের কবিতা 'আমি এত বয়সে গাছকে বলছি' সুরের মধ্যে টেনে এনেছেন। এই শেষ গানটিতে প্রতুলদা তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গের মত করে বলেন ওঠেন, হাঃ হাঃ আমি গাছকে বলছি, এই আপত সুরহীনতা নির্দিষ্ট করে দেয় গানের কথা কখন অমোঘ হয়ে বুকের ভিতর নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে চলে। গানগুলির সুরের ধারায় কোন নির্দিষ্ট কাঠামো মেনে চলা হয়নি। 'ডিঙ্গা ভাসাও' কিংবা 'আমার মাগো' গানে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করা হয়েছে আবার স্লোগান কিংবা লঙ মার্চের গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কথা হচ্ছিল প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে সংজ্ঞায় বাঁধা যায় কিনা তা নিয়ে। প্রতুলদার

অনুষ্ঠান যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলতে পারবেন। তাঁর গানে শুদ্ধ আবেগের চেয়ে আবেগ আর চিন্তার যথাযথ মিশ্রণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর তাঁর গায়নশৈলী এই চিন্তার ব্যাপারটাকেই মূর্ত করে। যে স্বপ্ন আবেগ নিয়ে আমাদের পথ চলা সেই স্বপ্নকেই চিন্তার জগতে এনে দাঁড় করিয়ে দেন শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। এযেন অনেকটা স্বপ্নের গানকে চিন্তার গানে পরিণত করা।
শৈবাল বিশ্বাস ৩১ জানুয়ারী ১৯৯৪, প্রতিদিন

যেতে হবে

এই প্রকাশ অনিবার্য, অমোঘ ছিল। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তিনি আমাদের চেতনার ব্যান্ডমাষ্টর, টর্চবেয়ারার। একটি লাইলাক্ ফুল বা একটি ভালো গানের জন্য কঠিন ঝোড়ো সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে লক্ষ যোজন দূরে যাওয়া যেতে পারে।

তাই আমরা প্রতুলের সঙ্গেই যেতে চাই ফুল তুলতে, গান শুনতে। কেন না তিনি ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলতে পারেন "সারা জীবন যে স্বপ্ন তুমি দেখ, তাকে বন্ধু বেচো না।" প্রতুলের প্রথম ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে অন্বেষণ ও গাথানীর যৌথ প্রয়াসে। এদের ধন্যবাদ। এরা একটা প্রশংসনীয় কাজ করলেন। ক্যাসেটে মোট দশটি গান আছে। প্রত্যেকটি গান আলাদা আলাদা, সুগীত এবং সুর-সমৃদ্ধ। অকারণ কথার জাগলারি নয়। এখানে প্রতুল কয়েকটি গানে তাঁর প্রথাকে ভেঙেছেন—যন্ত্র ব্যাবহার করে। এবং তা খুবই সুন্দর ও নৈপুণ্যের সাথে।

প্রয়াত কবি সমীর রায়ের 'আলু বেচো, পটল বেচো', কবি অরুণ মিত্রের 'আমি এত বয়সে', 'ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে', 'স্লোগান', মাও জে দঙের 'লং মার্চ', নিজের রচনা, 'আমি বাংলায় গান গাই', উল্লেখযোগ্য। আশা রাখি এই জনপ্রিয় গানগুলো আরও জনপ্রিয় হবে। শুধু একটি অনুযোগ—প্রতুল কেন জেদ ধরলেন না—যে ক্যাসেটটি 'গণসঙ্গীত নাম দিয়েই প্রকাশ করতে হবে। গণসঙ্গীত কী শুধুই মিটিং মিছিলের গান? শুধুই কী পতাকা সঙ্গীত (কিছু অর্ধশিক্ষিত সমালোচকের ভাষায়)? এটা প্রতুলও বিশ্বাস করেন না। তবে কেন? তবুও রুচি ফেরানোর আন্দোলনে তিনি আমাদের অক্লান্ত সহযোদ্ধা।
অজিত পাণ্ডে ২২ মার্চ ১৯৯৪, গণশক্তি

প্রতুলের সঙ্গে 'যেতে হবে'

আমার ছোট্ট মেশিনে অন্বেষণ নিবেদিত তাঁর 'যেতে হবে' শীর্ষক ক্যাসেটটি

চালিয়ে দিই আর, এই প্রথম প্রতুলকে নিছক শুনতে শুনতে দেখবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি। প্রতুলের গানের প্রধান সম্পদ, তাঁর সর্ববিস্তারী স্বরক্ষেপ। কাছ থেকে দূরে দূর থেকে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কখন আমাদের মুখের একেবারে সামনে এসে অধীরতায় উত্তর দাবি করে। হ্যাঁ, জোর দিয়েই বলতে পারি, যাঁরা কখনও প্রতুলকে গাইতে দেখেননি, এই ক্যাসেটের হোয়াংহো-গঙ্গায় তাঁদেরও কিন্তু ভরা অবগাহন হয়ে যাবে। এখানে তাঁরা একসঙ্গে পেয়ে যাবেন একটা কুসুমবন নিংড়ে নেওয়া নির্যাস। 'জন্মিলে মরিতে হবে রে' গানে লোকগীতির মূর্ছনা। 'আমার মা গো'তে গোয়ালপাড়ার মাহুতবন্ধুর সুরের ছোঁয়া। পর মুহূর্তেই এ হেন মেঠো পরিবেশের ঘোর কাটানো, মাও জে দং-এর অনবদ্য কবিতা 'লং মার্চ'-এর সামরিক কুচকাওয়াজ ও বিপ্লবী উল্লাসের আশ্চর্য মেলোডি। গানটি শুনতে শুনতে পুরনো লোকদ্বের কি মনে পড়ে যাবে না লহমার জন্য 'শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি'র সুরকার সলিল চৌধুরিকে? যাবে। কানোরিয়া জুট মিলের বীর শ্রমিকদের লড়াইয়ের সহোদর সদ্যপ্রয়াত কবি সমীর রায়ের 'আলু বেচো ছোলা বেচো' এবং বিপ্লবী শহীদ চেরবাণ্ডারাজুর 'আমাদের যেতে হবে'—এই দুটি প্রত্যয় ও সংগ্রামের গানে প্রতুল বিস্ময়করভাবে মেশান ছড়াগানের ঢঙের পাশাপাশি ভাঙা রাগে শস্যশেষ মাঠের বিষন্নতা। ক্যাসেটের অন্যপিঠের গোড়াতেই যখন 'আমি বাংলার গান গাই'—এই ঢালা বাংলা সুরের গানটি হঠাৎ প্রতুল উচ্চারণ করেন এবং পুনরাবৃত্তি করতেই থাকেন, 'আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ', তখন যেন জন্মের কান্না আমাদেরও কণ্ঠনালি চেপে ধরে। সাগরের কল্লোলিত ডাক ঘনিয়ে আসে 'ডিঙ্গ ভাসাও' গানটিতে। অসম্ভব মায়া ও স্পর্শ দিয়ে নতুন ঘুমতাড়ানি গানে প্রতুল ছুঁয়ে দেন 'ছোট ছোট দুটি পা'। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মতই সরল, মর্মস্পর্শী সুরে দুলে ওঠে 'ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়'। আর, অমরতা দাবি করে ক্যাসেটের অন্তিমে অরুণ মিত্রের 'যেতে হবে' কবিতাটির সুরারোপ, বিশেষত যখন প্রতুল গেয়ে ওঠেন, 'খরায় মাটি ফেটে পড়ছে/আর আমি হাঁটছি রক্তপায়ে/যদি দু-একটা বীজ ভিজে ওঠে.....।' খরার মাঠে আপনি বারবার এরকম একবুক বসন্ত নিয়ে আসুন, প্রতুল।

অমিতাভ দাশগুপ্ত ২৩ মার্চ ১৯৯৪, আজকাল

যেতে হবে আরও দূর

মনে পড়ে এক দেড় দশক আগে এক প্রত্যন্ত গ্রামে ছেঁড়া চটে বসে হ্যাজাকের

হলুদ আলোয় প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান আমরা মগ্ন হয়ে শুনেছি। শহরের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলেও শুনেছি আজও একই এবং অভিন্ন সেই প্রতুলদা। দায়বদ্ধতার প্রশ্নে প্রাণবান এই মানুষটি সমগ্র অভিব্যক্তিতে হয়ে ওঠেছেন এক ক্যারিসমা। ২৫ বছর তিনি গান গাইছেন, অথচ প্রায় সব গণমাধ্যম ও সংবাদপত্র মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। অস্বাস্থ্যকর ইঁদুর দৌড়ে কখনও প্রতুলদা নেই। তুলনায় নিঃশব্দে লড়ে যাচ্ছেন মানুষের ভালবাসা আর বুকের উত্তাপ নিয়ে। তা না হলে এ গানের নতুন ফর্মকে তিনি এভাবে বিকাশ ঘটাতে পারতেন না। কেননা, শুধুমাত্র ভঙ্গি দিয়ে ভোলাবার মানুষ নন প্রতুলদা। সময়ের শিকল কেটে কেটে তাঁর অনিবার্য পরিক্রমা। প্রতি মুহূর্তেই তার নতুন প্রজ্ঞা, যা একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে সত্য, যা আমাদের তাঁর প্রতি প্রদ্ধাবনতঃ করে। সম্প্রতি 'অন্বেষণ'-এর নিবেদনে শ্রোতারা পেয়েছেন তাঁর ১২টি গানের অনবদ্য ক্যাসেট 'যেতে হবে'। আমরাও বলি ঃ হ্যাঁ প্রতুলদা, যেতে হবে আরও দূর।

গালিব ইসলাম ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ আজকাল

পানু পালের সম্মানে গান

গত ১৬ জানুয়ারি জ্ঞানমঞ্চে বিভাবন-এর উদ্যোগে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের একক গানের আসরটি নিবেদিত ছিল পানু পালেরই সম্মানার্থে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পানুবাবুর স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হল অসুস্থ নাট্য -সংগ্রামীর চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য। তারপর নিরাভরণ মঞ্চে এলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। আমরা দেখলাম, কোনও রকম ভান-ভনিতা ছাড়া, শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রমাণের কোনও সরব আড়ম্বর, উচ্চকিত ঘোষণা ছাড়াও, গান কিভাবে প্রতিবাদের, প্রতিজ্ঞার. অনুভবের উদ্দীপনার মন্ত্র হয়ে উঠতে পারে! আমরা দেখলাম, কি অবলীলায় তিনি যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যাপারটাকেই অপ্রয়োজনীয় করে দেন—একটা তুড়ি কিংবা গানের চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্তে একটা অমোঘ হাততালি একেবারে অন্যরকম এক সঙ্গীতিক পরিবেশ তৈরি করে, শ্রোতারা যেখানে তথাকথিত 'আদেশ' 'অনুরোধ' বা 'প্ররোচনা' ছাড়াই ছন্দ-তাল মিলিয়ে করতালি দেন, শিল্পীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন গান। সে গান কখনও দু-টাকা রোজে শিশু শ্রমিকের জীবন কাব্য, কখনও পাথরে পাথরে আগুন ঝরানো 'লঙ মার্চ' কখনও বা আগামীর স্বপ্নে 'বাবরের

প্রার্থনা'! এই বিরল, অনন্য 'মেটামরফসিস'-এরই আরেক নাম প্রতুল মুখোপাধ্যায়।

১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ আজকাল

প্রতুলের লাল টুকটুকে স্বপ্ন

বেশ দেরিতেই পেলাম 'যেতে হবে'। একটা অসহায়বোধ কাজ করল। এই কন্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত হতে সময় লাগল দীর্ঘ পঁচিশ বছর? বাংলা গানের জগতে এখন যে রেনসাঁ পর্ব চলছে তারই এক অক্লান্ত যোদ্ধা প্রতুল —চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন একনাগাড়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর' ধরে, একরকম খবরের অন্তরালে থেকেই। লিরিকবিহীন হাল আমলের বাংলা কবিতায় খুব সামান্য যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহারেও যে এভাবে সুর চাপনো যায় শুধু মাত্র সুরের ঢেউকে অবলম্বনে করে, তা জানা ছিল না। 'ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে'র 'ডিঙ্গা' শব্দটিকে যেভাবে বিভিন্ন স্কেলে দুমড়ে মুচড়ে সুরের ঢেউ তুলে হাজির করেছেন খালি গলায়—মনে হচ্ছে সাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে ডিঙ্গা চেপে আমরাই যেন এগচ্ছি। কোথায় জানি না, শুধু জানছি 'যেতে হবে'। সেই বিখ্যাত 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল'র টিউনে যে এভাবে গৃহস্থালী বাংলা কথা ঢোকান যেতে পারে, আগে কোনওদিন ভাবিনি। অরুণ মিত্রের কবিতাকে গান করা এক দুসাহসিক প্রচেষ্টা। সুমনের গানে যখন নতুন করে হাল ধরতে শুরু করেছি তখন প্রতুল এসে শুনিয়ে গেলেন 'বন্ধু তোমার লাল টুকটুকে স্বপ্ন বেচো না।'

সন্দীপ মুখোপাধ্যায় আজকাল ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

অবিশ্বাস্য বিস্তার

প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে জনসমক্ষে নিয়ে অসবার জন্য 'অন্বেষণ' ও 'গাথানি' রেকর্ড কোম্পানি সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ। পীড়াদায়ক চলতি বাংলা গানের সমান্তরালে জীবনমুখী যে গানের ধারা শুরু করেছিলেন সুমন চট্টোঃ, প্রতুলবাবুর 'যেতে হবে' সেই বিপ্লবের বিজয় বৈজয়ন্তীকেই সোচ্চার করে তুলেছে। মোষ তাড়ানো সহজ নয় তবু 'ক্ষ্যাপা মোষের ঘার্ড় ভেঙে' শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শ্লোগান' প্রকাশ্যে তুলেছেন। প্রতুলবাবু তাঁর লাল টুকটুকে স্বপ্নকে ধরে রেখেছেন বুকে, তাঁর কলমকে বেচে দেননি সস্তা কথার বাজারে, 'সাপের মাথায় পা দিয়ে' যেন কালীয় নাগকে বধ করেছেন। দু-

একটি গানে কি বোর্ড ও গিটারের কর্ডগুলি হয়ত নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা যেত, তবু এইসব ছোটখাটো ত্রুটিকে ভুলিয়ে দিয়েছে প্রতুলবাবুর অসামান্য সুরেলা গলা ও গলার অবিশ্বাস্য বিস্তার। 'ডিঙা ভাসাও' 'যেতে হবে' গান দুটির রূপকল্পে যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়!

ডাঃ অমিতরঞ্জন বিশ্বাস। আজকাল ২৫ ফেব্রুয়ারি-১৯৯৪

তুলনা নয়

আপনাদের কাগজে সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান সম্পর্কে কিছু চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিতে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য প্রশংসার স্বর উচ্চারিত হলেও, কিছু কিছু চিঠিতে তথ্যগত ভুল থেকে যাচ্ছে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্য কোনও গায়কের তুলনা অথবা তাঁকে কোনও শিল্পীর উত্তরসূরি বলে অভিহিত করা হচ্ছে। সম্ভবত এই পত্রলেখকরা প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান সম্পর্কে খুব বেশী অবহিত নন। পত্রলেখকদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না কারণ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বেশ কয়েকজন শিল্পী তাঁদের গানের চূড়ান্ত প্রচার পেলেও প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এই প্রচার পেতে অনেক দেরি হয়েছে। প্রতুল মুখোপাধ্যাকে কেউ কেউ নবাগত অথবা তরুণদের দলেও ফেলেছেন। অথচ প্রতুল মুখোপাধ্যায় সত্তর দশক থেকেই মাঠ-ময়দানে জীবনমুখী গান করে আসছেন। গণ আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, প্রতুল মুখোপাধ্যায় বহু বছর আগে থেকেই তাঁদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত।

সোমনাথ ভট্টাচার্য আজকাল ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

The moving song

The high note of Mukhopadhyay's repertoire is that he sings without the accompaniment of any musical instrument. He has a voice that is rare in Indian males and is sometimes found among Baul singers of Bengal. It is definitely a tenor (the highest vocal pitch in a male voice) if not a counter tenor.

He also renders the musical interludes vocally—a creative effort reminiscent of the oratorios in Italian operas and which sounded quite delightful in the numbers '*Lal Piprer Gaan*' and '*Pipilikar Desh Darshan*' where he simulated the trumpet and the harmonium

respectively. Pratul Mukhopadhyay began the evening with a nod to the South, when he sang *Aamaader Jete Hobey*-a Cheda-Bandaraju poem translated by Pradip Goswami and set to tune by the singer himself. In this rendition, some undeniable shades of Bhupen Hazarika comes through. Although he sings his own lyrics, the evening's numbers were mostly verses of well-known writers like Jyotindra Mohan, Annada Shankar Roy, Sukumar Roy, Samir Roy and Partho Bandhopadhyay. The latter's *Hele Saap* which the singer declared was a fight against fear and his own composition *Kalindi* had a Santhali touch, where he added local colour by taking a few steps reminiscent of a Santhali dance. His own composition *Dingao Sagore Bhashao* done in the boat-man's tradition had Western overtones especially since it was couched in jazz rhythm. Mukhopadhyay has a good vacal range. He hits the notes with clarity and precision. His entire body sings along with him. which made Suman Chattopadhyay comment '*Lok tai ekti aasto gaan*' (the man himself is a song). With some more stage-presence, Mukhopadhyay would have created waves long ago, when Bengal suffered from the illusion that it was bereft of talented musicians.

Madhumita Mukherjee 4 March 1994 Amrita Bazar Patrika.

প্রতুলের গান নিয়ে এবার ভিডিও ক্যাসেট

শুক্রবার সন্ধ্যায় ম্যাক্সমুলার ভবনে প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তোলা ষাট মিনিটের একটি ছবি দেখার পর আর কোন সন্দেহই রইল না, প্রতুল পুরো শরীরটাকেই সঙ্গীতে বেঁধে নিয়েছেন। হাতঘড়ি খুলে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় তিনি গান শুরু করবেন নাভিমূল থেকে। কখনও মৃদু হাততালিতে। কখনও অট্টহাসিতে আবার কখনও গানের একটি শব্দকেই উচ্চারন করে গানের প্রিলুড ইন্টারলুড মিউজিক করে দেবেন।

কোনরকম যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়া গান বাংলায় বোধহয় প্রথম তিনিই। ছবিটির সাক্ষাৎকারে পরিচালক গৌতম ঘোষকেও প্রতুল বলেছেন, 'যন্ত্রের বাঁধনটা আমার কাছে পাখির খাঁচার মতন। মুক্ত আকাশে আমি গান ও গলাকে ছড়িয়ে দিতে চাই। সুর-তাল-লয়কে কোনো কাঠামোয় বাঁধা নয়, বাঁধন খুলে মুক্তি দেওয়াতেই আমি বিশ্বাস করি।'

সেই বিশ্বাসের নমুনা প্রতুল দেখালেন ছবিটিতে ছড়ানো খান কুড়ি গানে। হ্যাঁ অনেকগুলি গানই কবিতায় সুরারোপিত কখনও শঙ্খ ঘোষ, কখনও বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, আবার কখনও স্বরচিত। তাঁর উদাত্ত গলায় ওঠানামা দারুণভাবে খেলা করে। মাইক্রোফোনটিকে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে থেকে তিনি ধরেন। গানের সঙ্গে অভিব্যক্তি নিয়ত পরিবর্তনশীল। ...মানস ভৌমিক পরিচালিত নাতিদীর্ঘ ছবিটির বড় আকর্ষণ নিশ্চয়ই প্রতুলের গান, তবে গৌতম ঘোষের পাশে বসে একান্ত হয়ে তিনি যখন নিজের কথা বলেন সেটিও ছবির এক দুর্দান্ত আকর্ষণ হয়ে ওঠে।
নির্মল ধর ২৫ এপ্রিল ১৯৯৪ প্রতিদিন

Slogan And The Song

Writing and composing music has never been a profession for Pratul but essentially an expression of a deeply felt commitment to the struggle for democracy and justice. That is why even in the turbulent sixties and seventies when his songs like *Long March* and *Mukto hobey mor matri bhoomi* provided inspiration to young revolutionaries, no one knew who the writer was. They appeared discussed in little magazines by people no less than Hemanga Biswas.

Pratul quietly provided music for the alternate theatre. In 1983, however, Pratul the singer was discovered by the School of People's Arts. He was also inspired by an anthology, *Dhuye dhuye talwar* by the rebel poet Cherbanda Raju. He set to tune *Ki amader jaat* and *Amader jetey hobey durey* and sang them at

m etings rallies and demonstrations. Could there have been a more effective slogan ? It was this that nurtured his musical instincts.

Gradually, however, the form of his songs changed and he immersed himself in experiments. It was nothing new really ; it harked baek to his young days when he experimented with the poems of Bishnu De and Buddhadeva Bose. Two of his perennial favourites—*Alu bachao* by Samir Roy and *Slogan dite giye* by Partha Banerjee—were composed during this period. And from this sprung another phase of his creativity and *Vin deshi ek pagal*, composed on the death centenary of Marx, was the result.

Pratul Mukherjee had been identified with the masses long before the proscenium and the media rediscovered him. Rediscovered is the word, for he is now the song lover's dream capturing a lost world but also speaking of values that might yet save society.

May 15, 1994 The Sunday Statesman.

□

"**অন্বেষণ**"এর নিবেদন

এবার ৬০ মিনিটের ভিডিও ক্যাসেটে

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান

সঙ্গে **গৌতম ঘোষের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার**

সম্পাদনা ও পরিচালনা ঃ **মানস ভৌমিক**

চিঠিপত্রে যোগাযোগ ঃ **অন্বেষণ**

২৩৬, এন. এস. সি. বোস রোড

পঞ্চম তল, ফ্ল্যাট নং-১৬

কলকাতা-৭০০ ০৪০

শতকের শপথ

পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক বিদ্যুতের গড় চাহিদা আনুমানিক ২২০০ মেগা-ওয়াট। হিমালয় থেকে সাগর পর্যন্ত মহীরুহসম আটত্রিশ বছরের প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ পর্ষদ যেমন একদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে জনগণের উপরোক্ত চাহিদাপূরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে দিবারাত্রি।

তেমনি অন্যদিকে সিঁধেলদের নবসংস্করণ 'হুকেল"-দের দৌরাত্ম্যের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন সামাজিক সমস্যা ঃ ব্যাপকহারে বিদ্যুৎ চুরি। যার জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সব জায়গায় সব সময় সঠিকভাবে বিদ্যু সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। আগামী বছরগুলিতে এদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন দুই ক্ষেত্রেই আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ এই সংগ্রামের শরিক হয়ে হুকেলদের বিরুদ্ধে সর্বত্র তৎপর হোন।

প্রত্যাশার প্রতীক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

The Statesman 29 August 1992

Snigdha and Samaresh Banerjee Showed that 19 years have not dimmed or commercialized their ultimate vision of songs and dances that continue to address central themes of human existence in their composition.

দেশ ১১ই জুলাই ১৯৯২

বাংলা শতাব্দীর শেষ পঁচিশে বৈশাখের ধাক্কা সামলাতে সবাই যখন দম নিচ্ছে, তখনই ক্যালকাটা পিপলস কয়্যার-এর প্রথম সন্ধ্যা বয়ে নিয়ে এল এক আশ্চর্য সতেজ প্রাণবন্ততা যার জন্য কয়্যার প্রধান সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোটবড় প্রতিটি শিল্পীকে আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন।

আজকাল ৫ই আগষ্ট ১৯৯২

গানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার উদাত্ত কণ্ঠ, সুরঋদ্ধকণ্ঠ ও বিশিষ্ট গায়নভঙ্গীর জন্য আর স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় মাতিয়ে রাখেন নাচ, অভিনয়, পরিচালনায় সংঘবদ্ধ ত্রিবেণী সঙ্গমে। শিশু শিল্পীদের "ভাল্লুক মৌমাছি" কিন্তু চিন্তা ভাবনায় খুব পরিণত।

আনন্দবাজার ১৯ আষাঢ় ১৩৯৯

"জীবনের জন্যে ভালবাসার জন্যে" অনুষ্ঠানে মুগ্ধ করেন সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কণ্ঠে বিভিন্ন আধুনিক, লোকসঙ্গীত পেয়েছে এক আশ্চর্য গভীরতা। এদিন নিজের সুরে গাওয়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা 'এমনওতো হয় কোনদিন' অনবদ্য পরিবেশন। ভাল লেগেছে জীবনানন্দ দাসের 'আবার আসিব ফিরে' সমবেত সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গে স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিকল্পনা।

ক্যালকাটা পিপলস কয়্যার

৪/এ, বন্দেল রোড

কলকাতা-৭০০ ০১৯

দূরভাষ ঃ ২৪৭-৬৩৩৪

With best compliments from :

CONTINENTAL COMMERCIAL CO. LTD.

8/1, B. B. D. BAG (EAST)
CALCUTTA-700 001

Phone : 220-4262/220-4263/220-5483/220-0549

"অন্বেষণ"

নিবেদিত

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানের ক্যাসেট

যেতে হবে

গাথানী ক্যাসেটে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

GATHANI RECORDS CO.

2, TEMPLE STREET

CALCUTTA-700 072

With best compliments from

A. O. P. (INDIA) PRIVATE LIMITED

127/1, ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE ROAD

C A L C U T T A - 7 0 0 0 1 4

Phone : 27-2636/5321

26-8781

Space donated by

Subir Chakravarty

With best compliments from

P. R. Home Consultancy Pvt. Ltd.

Site Off. : **13/1, RITCHIE ROAD**

CALCUTTA-700 019

Phone : 475-4227

With best compliments from

Nice Fotolab

Agent : **M/s. FRANK ROSS LTD.**

15/8, JAWAHARLAL NEHRU ROAD

CALCUTTA-700 013

Phone : 29-1745

Stockist/Distributors of **KONICA MEDICAL X-RAY FILMS**

With best compliments from :

UNITED MACHINERY

&

APPLIANCES

12, GANESH CHANDRA AVENUE

CALCUTTA-700 013

Phone : 27-9500/27-9630

With best compliments From :

Indo-Aryan Publicity

1, BRITISH INDIA STREET

(7th Floor)

CALCUTTA-700 069

Phone : 248-2870

Space donated by :

A Weel Wisher

Compliments from :

Timir Printing Works Private Ltd.

43, BENIAPUKUR LANE

CALCUTTA-700 014

Phone : 244-7702/244-7583

1, CHANDNEY APPROACH

CALCUTTA-700 072

Phone : 27-5360

পর্বান্তর

এখন কলকাতার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

সৌজন্যে

নাম্বার টেন

নিউ টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড

প্রযত্নে ঃ মেসার্স আর ডি বিল্ডার্স এণ্ড ডেভেলপার্স লিমিটেড
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড পোঃ কামারহাটি কলকাতা ৭০০ ০৫৪

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক

Declaration No 26/94
PARVANTAR
SHILPA SAHITYA BISHAYAK TRAIMASIK Vol.1 No. 3 July 1994 Rupees Ten only

Build Your base on our Concrete Commitment
NEW ALIPORE MARKET COMPLEX

Comfortable shopping in a fashionable market, from garments to electronic items, from jewellery to medicine, from sports to leather goods, every thing under one, easily accessible roof which will also house banks, guest houses, commercial and corporate offices.

The Project :

For easing pressure from the central area of this 300 year old metropolis and to facilitate people, Calcutta Municipal Corporation has drawn up plans and awarded Cityscape Developers(P) Ltd to set up a commercial complex with better infrastructure and elite orientation.

Situated in the heart of New Alipore (beside Durgapur Bridge) this posh complex is well-connected by state and private transport services.

The project involves the construction of two interlinked six-storied structure with all the facilities of an ultra-modern business complex. The first two floors will have an extensive shopping area and the remaining floors will be reserved for offices, guest houses, nursing homes, banks etc.

Special Features :

1) Driveway to first floor from the road approaching market from Durgapur Bridge.
2) Huge parking space within the complex
3) Centrally air-conditioned shopping area
4) Escalator between shopping floors.
5) Roads and open spaces on all four sides

Special Booking offer :

If you want pomp and prestige for your shop or commercial set-up, this is the right place for you. For further details, kindly contact at our site.

Owner	*Developers*	*Principal Consultant*
THE CALCUTTA MUNICIPAL CORPN.	**CITYSCAPE DEVELOPERS PVT. LTD.**	**A K PROPERTY CONSULTANT**
5,S.N.Banerjee Road, Calcutta-700013	CMC New Alipore Market, Calcutta-700053	105, Park Street, Kohinoor Building, 4th floor, Flat 22, Calcutta-700016 Ph:295521/5991/9933/2350

প্রকাশক ঃ এস. দাশগুপ্ত, ৫২ এ হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯
মুদ্রক ঃ বিশ্ববার্তা প্রেস, ৪৪/৪ গরচা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯